যারা বড় হতে চাও

ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়

যারা বড় হতে চাও

বড় হওয়া ও জীবনে সাফল্য অর্জন করার নির্দেশক গ্রন্থ

ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়

দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

JARA BARO HOTE CHAO
by PARTHA CHATTOPADHYAYA
Published by Subhas Chandra Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Stree, Calcutta 700 073

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০০, মাঘ ১৪০৬

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

অলংকরণ : প্রবীর সামন্ত

ISBN-81-7612-582-2

প্রকাশক : সুভাষচন্দ্র দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০-০৭৩

লেজার সেটিং : লোকনাথ লেজারোগ্রাফার
৪৪এ, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০-০০৯

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে, দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০-০৭৩

লেখকের অন্যান্য বই :

আত্মবিকাশের বই

হতাশ হবেন না (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ)

হতাশ হইনি (১ম)

কেমন করে মানুষ চিনবেন?

কেমন করে বাস্তববাদী হবেন

গোয়েন্দা কাহিনী

কিশোর রহস্য অমনিবাস

কিশোর রোমাঞ্চ অমনিবাস

মিশন-০০৩

হাসির বই

রাশি রাশি হাসি

ফেলু মামা দি গ্রেট

ফেলুমামার সাত কাণ্ড

দুই বাংলার কিশোর-কিশোরীদের হাতে,
যারা বড় হতে চায়।

উপহার

যারা বড় হবার ইচ্ছা জাগে সেজন্য
শ্রীমান/শ্রীমতি.....
..... কে এই
বইটি উপহার দিলাম।

ইতি

ভঁমর সে লড়ো, তুন্দ্ লহরো সে উলঝো,
কঁহা তক চলোগে, কিনারে কিনারে।

---রাজা হমদানী

ঘূর্ণীর সঙ্গে লড়াই করতে শেখো, তীব্র তরঙ্গের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ো। কতদিন আর কিনারে কিনারে হাঁটবে? পরের জীবন নয়, ঝড়ের জীবনে অবগাহন করে সোনা হয়ে ওঠো, মিনার থেকে নেমে এসো মৃত্তিকায়, তীর থেকে নেমে এসো সাগরে।

সূচিপত্র

গোড়ার কথা..... ৭
কে কে বড় হতে চাও?..... ১৫
আকাশ যাদের সীমা..... ২১
কেন পান্থ..... ২৪
উদ্যমী পুরুষসিংহ..... ৩৮
আবার তোরা মানুষ হ..... ৫৪
কমন করে বড় হবো?..... ৬১
চরিত্রের সন্ধানে..... ৬৩
জ্ঞানের খোঁজে..... ৮০
স্মার্ট বয় : স্মার্ট গার্ল..... ৯৫
যখন বাড়িতে..... ১০১
কেমন করে কথা বলবে?..... ১০৫
শেষ কথা..... ১১০
পরিশিষ্ট..... ১১৫

❁ ❁ ❁

গোড়ার কথা

এই বইটি আমি লিখেছি ভারত ও বাংলাদেশের স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের কথা মনে রেখে। তবে যে কোন বয়সের মানুষই এই বই পড়ে কিছু না কিছু অনুপ্রেরণা পাবেন।

আমি যখন ইস্কুলে পড়তাম তখন আমাদের ইতিহাসের মাস্টারমশাই ছেলেদের পড়া না পারলে বলতেন—তোর কিচ্ছু হবে না। যা বাপের সঙ্গে লাঙল চষগে যা। কাউকে বলতেন, যা গরু চরা— লেখাপড়া তোর জন্য নয়। আমাকেও তিনি বলেছিলেন—ক্লাস এইটের বেশি বিদ্যে আমার নাকি কপালে নেই। আমার মনের জোর ছোটবেলা থেকে একটু বেশি বলে আমি এসব কথার কান দিইনি।

পৃথিবীতে সব সময় দুধরনের লোক থাকে। একদল হল ইতিবাচক লোক যারা সব সময় উৎসাহ দেন আর একদল সব সময় সব কিছুতে লোককে নিরুৎসাহ করেন। 'এটা হয় না'। 'ওর কিছু হবে না। ওটা একটা গাধা।' এইসব নিরুৎসাহবাচক কথা শুনে বহু ছেলেমেয়ে হতোদ্যম হয়েছে। অনেক ছেলেমেয়ে আত্মহত্যা পর্যন্ত করেছে। এইসব নানা ঘটনা দেখে আমি ঠিক করি আমি একটা আন্দোলন গড়ে তুলব যার উদ্দেশ্য হবে ছেলেমেয়েদের শুধু উৎসাহিত করা। বিশেষ করে শুনে শুনে যাদের মধ্যে ধারণা হয়েছে তারা অপদার্থ। আমি বলতে চাই পৃথিবীতে কোন প্রাণীই অপদার্থ নয়। প্রত্যেকেরই একটা না একটা ভূমিকা আছে। কীটাণুকীটের জীবনও সৃষ্টি হয়েছে একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। প্রকৃতি থেকে তুমি যদি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যাকটেরিয়াকেও নির্মূল করে দাও তাহলে ঘোরতম বৈষম্য সৃষ্টি হবে। মানুষ তো সে তুলনায় শ্রেষ্ঠ জীব। তার দুটো হাত আছে, দুটো পা আছে। আর আছে অপরিসীম বুদ্ধি। প্রত্যেক মানুষ এসেছে একটি উদ্দেশ্য সাধন করতে। তারতম্য তাদের মধ্যে থাতকেই পারে। তবে অনুশীলন করে বুদ্ধিও বাড়ানো যায়। ইতর প্রাণীর যে সুযোগ নেই। তারা বুদ্ধির চর্চা ও অনুশীলন করতে পারে না। এজন্য সমস্ত প্রাণীর বুদ্ধি একই রকমের। গাধা যদি বোকা হয় তাহলে সব গাধাই বোকা।

কিন্তু সব মানুষ সমান বোকা, সমান চালাক নয়। বহু চালাক মানুষ এক এক পরিস্থিতিতে বোকা বলে যায় বা বোকার মত কাজ করে। এজন্য অনেক শিক্ষিত বুদ্ধিমান ব্যক্তি হয়তো ব্যবসায়ে লোকসান খাচ্ছে। প্রতারকের খপ্পরে পড়ছে। আবার কত অল্পশিক্ষিত লোক বুদ্ধি খাটিয়ে ব্যবসা করে সামান্য অবস্থা থেকে বড়লোক হয়েছে। পৃথিবীতে বহু জ্ঞানীগুণী লোকও অবৈজ্ঞানিক ধারণার বশবর্তী হয়েছে। তাঁরা এমন সব কাণ্ড করেছেন যা পরবর্তীকালে হাসির খোরাক হয়েছে। আবার অতি সাধারণ মানুষও অসাধারণ সব কাণ্ড ঘটিয়েছেন।

প্রতিভাবানদের সমকালের লোকেরা পাগল বলে। যখন স্টিফেনসন রেলগাড়ির ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন তখন সরকার তাঁকে ট্রেন চালাবার অনুমতিই দেননি। তাঁদের ধারণা ছিল লোহার রেলের ওপর দিয়ে জোরে কিছু চালালে চাকা লাইন থেকে পড়ে গিয়া দুর্ঘটনা ঘটবে। অনেক কষ্টে স্টিফেনসন অনুমতি পেলেন। কিন্তু যাত্রী বহনের অনুমতি পেলেন না। প্রথম ইঞ্জিন দিয়ে খনিতে কয়লা বহন করা হত। তারপর ১১ বছর পরে ১৮২৫ সালে স্টকটন থেকে ডার্লিংটন পর্যন্ত তিনি রেল চালাবার অনুমতি পান। পথ মঞ্চেস্টার থেকে লিভারপুল রেলপথ খুলতে দেওয়া হয়নি।

স্টিফেনসনকে নকল করে অনেক ব্যবসায়ী ইঞ্জিন তৈরি করে পরবর্তীকালে রেলপথের ব্যবসায়ে নেমে পড়েছিল। তারা বলত স্টিফেনসন আবার কে? রেল ইঞ্জিন আমরাই প্রথম তৈরি করেছি। যারাই নতুন কিছু সত্য আবিষ্কার করেছেন বা নতুন কিছু উদ্ভাবন করেছেন তাঁদের ভাগ্য এই স্টিফেনসনের মত।

তাঁদের বিরুদ্ধে নেতিবাচক লোকেরা নানা কথা বলেছেন। তাদের কৃতিত্বকে স্বীকার করতে চায়নি। রোনাল্ড হিল প্রথম যখন ডাকটিকিট প্রবর্তন করলেন তখন সেই অসামান্য উদ্ভাবন দেশের জনপ্রতিনিধিরা গ্রহণ করেননি। পার্লামেন্টে এ নিয়ে আপত্তি উঠেছিল। তাঁদের বক্তব্য ছিল এটি উদ্ভট প্রস্তাব।

বার্নার্ড গ্যালিলির বাড়ি ছিল ফ্রান্সে। তিনি ছবি এঁকে কাচ রঙিয়ে, জরিপের কাজ করে ঘুরে ঘুরে দিন কাটাতেন। একদিন তিনি একটি মাটির পেয়ালা কুড়িয়ে পেলেন। সেটি বাড়ি নিয়ে এসে তিনি ভাবলেন মাটির জিনিস বড় সহজে ভেঙে যায়। এমন মাটি যদি বানানো যায় যে সহজে ভাঙবে না। দেখতেও চকচক হবে। যেমনি ভাবা তেমনি কাজ। তিনি একটা চুল্লি তৈরি করে ভাঙাপাথর আর মাটি গলাতে শুরু করলেন। প্রচুর অর্থ নষ্ট হল। তাঁর স্ত্রী বলতে লাগলেন তাঁর স্বামী পাগল হয়ে গেছেন। এইভাবে দু'বছরের চেষ্টায় তিনি একধরনের পেয়ালা তৈরি করলেন। তার ওপর রাসায়নিক প্রলেপ চড়িয়ে আবার চুল্লিতে চড়ালেন।

দেখা গেল প্রলেপগুলি বেশ সেঁটে গেছে। তাঁর পরীক্ষা চলতে লাগল। একদিন তাঁর সব কয়লা ফুরিয়ে গেল। তিনি তখন বাড়ির বেড়া ভেঙে, ঘরের খাট ও চেয়ার কেটে তাদের পায়া জ্বালানি হিসাবে চুল্লিতে দিলেন। তাঁর স্ত্রী-ছেলেমেয়েরা কাঁদতে কাঁদতে শহরের রাস্তায় ছুটে লোকজনকে ডেকে বলতে লাগল, আমাদের বাঁচাও। আমার স্বামী পাগল হয়ে গেছে। সবাই ছুটে এল। এসে দেখল অবাক কাণ্ড। চুল্লি থেকে ঝকঝকে পালিশ করা পেয়ালা বেরুচ্ছে। ১৬ বছরের চেষ্টায় বার্নার্ড গ্যালিলি চীনামাটি আবিষ্কার করলেন। তিনি কি সত্যিই পাগল ছিলেন?

যে কোন বৈজ্ঞানিক সত্য তা যত সহজ ও সরল হোক এবং প্রমাণ দিয়ে বোঝানো হোক মানুষ তা গোড়ার দিকে মানেনি। আর এই না মানা মানুষদের মধ্যে অনেক বড় বড় বুদ্ধিমান লোকেরাও ছিলেন। অ্যারিস্টটলের মত মানুষও মনে করতেন, একটা হাল্কা ও একটা ভারী দুটো বস্তু এক সঙ্গে ওপর থেকে ফেলে দিলে ভারী বস্তুটা আগে পড়বে। দুটো যে একসঙ্গে পড়বে এটা বৈজ্ঞানিক সত্য। কিন্তু তাঁর মত পণ্ডিত লোকও তা বিশ্বাস করেননি। যেমন পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে এই তত্ত্ব বহু লোকই মানত না। তারা যে সবাই মূর্খ ছিল তা নয়। সুতরাং কে কী বলল, সে কথায় কান না দিয়ে প্রতিটি ছেলেমেয়ের উচিত এমন কিছু কাজ করে যাওয়া যাতে দেশ ও সমাজের উপকার হয়। সেই সঙ্গে তাদের মনের বিকাশ ঘটে। প্রতিটি মানুষের মধ্যে অসাধারণ কিছু করার ক্ষমতা আছে। নিজের ভেতরকার সে ক্ষমতাকে আবিষ্কার করতে হবে। এর জন্য যে পণ্ডিত হতে হবে, ইস্কুলের পড়াশোনায় 'গুড় বয়' হতে হবে তার কোন মানে নেই। শুধু চাই বড় কিছু একটা করার সঙ্কল্প।

যেমন দেশ আবিষ্কারক লিভিংস্টোন (১৮১৩) ছিলেন গরিব তাঁতীর ছেলে। তিনি ছিলেন শিশুশ্রমিক। দিনে ১৪ ঘন্টা করে তাঁকে খাটতে হত। সারাদিন পরিশ্রম করে লিভিংস্টোন রাতের স্কুলে পড়তে যেতেন।

ঊনিশ বছর বয়সে তিনি ঠিক করলেন ছ মাস পড়াবেন আর ছ মাস চাকরি করবেন। বছরে পড়ার সময় ছ মাস তিনি গ্লাসগো শহরে বাস করতেন। এইভাবে তিনি ডাক্তারি পরীক্ষায় পর্যন্ত পাস করলেন। ডাক্তার হয়ে তিনি ধর্ম প্রচারকের কাজ নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় গেলেন। তখন আফ্রিকা গহন জঙ্গলে ঢাকা। অর্ধেকের বেশি দেশ আবিষ্কারই হয়নি। লিভিংস্টোন এই দেশ আবিষ্কারের জন্য পর্যটক হয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিম আফ্রিকা যাবার পথ আবিষ্কার করলেন। এরজন্য তাঁর জীবন বহুবার বিপন্ন হয়েছে। লিভিংস্টোন যদি শত শত

শিশু শ্রমিকের মত ভাবতেন এই জীবনই আমাদের ভাগ্য। তাহলে সারাজীবন এইভাবে শ্রমিক হয়ে জীবন কাটাতে হত। যারা ছোটবেলা থেকে ভাবে আমাকে বড় হতে হবে, যারা ভাবে 'আমি এমন কিছু করব যাতে লোকে আমার নাম মনে রাখবে' তারাই বড় হয়। ধৈর্য, কঠোর পরিশ্রম আর নির্ভয়ে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলার পথে কে কী বলল সেদিকে কান দিলে আর বড় হওয়া যায় না। ডারউইনকে তাঁর বাবা ডাক্তারি পড়তে পাঠিয়েছিলেন। ডারউইন ডাক্তারিতে ভর্তিও হয়েছিলেন। কিন্তু অস্ত্রোপচার দেখে ভয় পেয়ে তিনি ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দিলেন। এরপর সংগ্রহ করতে লাগলেন নানাধরনের পোকামাকড়। প্রাণীতত্ত্বের নমুনা সংগ্রহের জন্য তিনি একটি জাহাজ কোম্পানির সঙ্গে শর্ত করে বিভিন্ন অজানা দ্বীপে ঘুরে বেড়ালেন। লোকে তাঁকে বলত তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

কিন্তু এই ডারউইন প্রাণীতত্ত্ব অথবা নৃতত্ত্বের ডিগ্রিধারী না হয়েও প্রাণীজগতের বিবর্তন সম্পর্কে যা আবিষ্কার করলেন তা পৃথিবীর প্রাণীজগতের ধ্যানধারণাকে বদলে দিয়েছে।

আমাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে নতুন কিছু করার ইচ্ছা নেই। ইচ্ছা থাকলে সেই ইচ্ছাকে ফলবতী করার মত জেদ নেই। ছেলেমেয়েরা এখন বড় হওয়া বলতে বোঝে বড়লোক হওয়া। খুব সহজে প্রচুর পয়সা উপার্জন করা। ডাক্তারি পাস করে নার্সিং হোম করা, যাতে সহজে কোটিপতি হওয়া যায়। অথবা ইঞ্জিনিয়ার হওয়া, যাতে একটা ভাল চাকরি পাওয়া যায়। যারা এই দুটোর একটায়ও পায় না তারা ভাবে জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেল। কিন্তু কত অসংখ্য তরুণ স্বাবলম্বী হচ্ছে। সামান্য অবস্থা থেকে জীবন শুরু করে অনেক বিরাট শিল্পপতি হয়েছে। কিন্তু আবার অনেক ছেলেমেয়ে খাটতে রাজি নয়। অনেকে ভাবে তারা পড়াশোনায় ভাল নয়, তাই তাদের বড় হবার অধিকার নেই।'

অনেকে প্রতিভা নিয়ে জন্মেছে। কিন্তু সে নিজেও জানে না তার মধ্যে প্রতিভা আছে। অনেকে জানে তার মধ্যে কিছু গুণ আছে। বড় হবার আকাঙ্ক্ষাও আছে। কিন্তু সে জানে না, বড় হতে গেলে কী করতে হবে। টমাস আলভা এডিসন, চার্লস ডিকেন্স, উইলিয়াম কেরি শিশু শ্রমিক ছিলেন। বহু মনীষীর মধ্যে কেউ ছিলেন গরিব পূজারী বামুনের ছেলে, কেউ মুচির ছেলে, কেউ তাঁতীর ছেলে। মেঘনাদ সাহা ছিলেন গরিব মুদির ছেলে। কিন্তু তাঁরা ছেলেবেলায় বুঝতে পেরেছিলেন তাঁদের মধ্যে বড় হবার উপাদান আছে। মানুষের জীবন গণিতের ফর্মুলা মেনে চলে না। যে কোন পরিস্থিতির বিরুদ্ধে মানুষ লড়াই করতে পারে। শুধু তার লড়াকু মন চাই। এই মন স্কুল জীবন থেকেই তৈরি করে দিতে হবে।

তা না করে শত শত নিষেধের বেড়াজালে ছেলে-মেয়েদের আবদ্ধ করে রেখে তাদের গতানুগতিক জীবনের মত করেই তৈরি করে দেয় আমাদের সমাজ। সব সময় এটা কোর না। ওটা কোর না। কিন্তু 'এটা করো', 'এইভাবে চল,' আমি বলি, তোমরা তোমাদের মত করে চল। সব পথই সিদ্ধির পথ। কেউ কেউ বলেন ডাকাত যদি হতে চাও সবচেয়ে বড় ডাকাত হও। সাধু যদি হতে চাও আদর্শ সাধু হও। কিন্তু আমি বলি ডাকাতের জীবনের শান্তি নেই। সম্মান নেই। দেশকে সে কিছু দেয় না। সে শুধু লুঠ করে। তাই মনে রাখবে মহাজনেরা যে পথ ধরে গেছে সেটাই পথ। শুধু যেন তেন প্রকারেণ একজন কেউকেটা হলেই হল না। জীবনে মূল্যবোধ চাই, চাই আদর্শ।

আর চাই একটি লক্ষ্য সামনে রেখে সেই লক্ষ্যে অবিচল থাকা।

মহাভারতে কৌরব ও পাণ্ডবদের অস্ত্রগুরু ছিলেন দ্রোণাচার্য। অস্ত্রগুরু মানে যিনি অস্ত্রশিক্ষা দেন। দ্রোণাচার্যের কাছে কৌরবেরা একশ ভাই আর পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই মিলে অস্ত্রশিক্ষা করলেন। শিক্ষার শেষে পরীক্ষার নিয়ম।

দ্রোণাচার্য একদিন তাঁর ছাত্রদের সবাইকে ডেকে বললেন, আজ তোমাদের পরীক্ষা নেবো। তোমরা কে কেমন ধনুর্বাণ চালনা করতে শিখেছ তা আমি দেখতে চাই। তোমাদের লক্ষ্যভেদ করার পরীক্ষা হবে।

পরীক্ষাটা কিছুই নয়। একটি গাছে একটি পাখির মূর্তি রয়েছে। পাখির দুটি চোখ। ওই চোখের ভেতর তীর বেঁধাতে হবে। যে বেঁধাতে পারবে সেই-ই পরীক্ষায় সফল।

এ আর এমন কঠিন কি! রাজপুত্ররা সবাই ধনুর্বাণ চালাতে পটু। কৌরব বলো, পাণ্ডব বলো সবাই অস্ত্রশিক্ষায় বেশ পারদর্শী। তাঁদের কাছে এ আর এমনকি কঠিন কাজ।

দ্রোণাচার্য মনে মনে হাসছেন। যত সহজ বলে ভাবছে তারা কাজটা তত সহজ নয়।

তিনি একে একে সবাইকে ডাকলেন।

হাতে ধনুর্বাণ দিয়ে দ্রোণাচার্য সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন কী করতে হবে। তারা যেই এক মনে পাখিটির দিকে তাক করেছে, অমনি দ্রোণাচার্য সবাইকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন।

কিছু দেখতে পাচ্ছ?

হ্যাঁ গুরুদেব।

কী দেখছ বল তো?

সবই তো দেখছি, দূরের গাছটা। গাছের ডাল, ডালে বসে রয়েছে পাখিটা—

উঁহু হল না, হল না। যাও তুমি উত্তীর্ণ হতে পারলে না পরীক্ষায়। তোমায় আর বাণ ছুড়তে হবে না। যাও, চলে যাও।

খুব অবাক হয়ে এক একজন ধনুর্বাণ ছেড়ে চলে যায়। বুঝতে পারে না, কোথায় তাদের ত্রুটি। তারা তো বাণই ছোড়েনি, তাহলে তারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারল না কেন? এই প্রশ্ন সবার মাথায় ঘোরে। কিন্তু গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করতেও সাহস পায় না।

সবশেষে ডাক পড়ে অর্জুনের।

দ্রোণাচার্য বললেন, শোন অর্জুন, ওই পাখির চোখে তীর বেঁধাতে হবে। তার আগে বল কী দেখছ?

অর্জুন পাখির চোখের দিকে ধনুকে টিপ করে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, শুধু চোখ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না গুরুদেব।

আর কিছু দেখতে পাচ্ছ না?

না গুরুদেব, আর কিছু না। খালি চোখ।

দ্রোণাচার্য তখন সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, তোমারই হবে অর্জুন। তোমার অস্ত্রবিদ্যা শেখা সার্থক হয়েছে। তোমার আছে একাগ্রতা, একাগ্রতা থাকলে আর কোনও দিকে খেয়াল থাকে না। একটা লক্ষ্যের দিকে শুধু দৃষ্টি থাকে।

অর্জুন শিখেছিলেন, কোনও কাজে সাফল্য লাভ করার প্রথম উপায় হল, ওই কাজটাকেই জীবনের ধ্যান-জ্ঞান করা। এই জন্য লক্ষ্যভেদের সময় অর্জুন গোটা পাখিটাকেও দেখেননি, দেখেছিলেন তার চোখ।

এইজন্যই দ্রোণাচার্যের মতে একমাত্র অর্জুনের অস্ত্রশিক্ষা সফল।

একমন হয়ে কোনও কাজ করাকে বলে একাগ্রতা। একাগ্রতা না থাকলে কোনও কাজে সাফল্য অর্জন করা যায় না।

প্রত্যেক মানুষেরই ছোটবেলা থেকে একটা লক্ষ্য ঠিক করে নেওয়া উচিত। সে লক্ষ্যটি হল বড় হয়ে কে কী হতে চায়। তারপর একাগ্র মনে সেই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া দরকার। সবার আগে নিজেকে ভাল করে জানতে হবে যে সত্যি আমার মধ্যে বড় হবার উপাদান আছে কি না। যদি থাকে তাহলে তার অনুশীলন করতে হবে।

ছেলেমেয়েদের আমি এই কথাটা বলতে চাই ব্যর্থতা বলে কিছু নেই। ব্যর্থতার স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে থাকে সাফল্য। একবার টমাস আলভা এডিসনকে

এক রিপোর্টার প্রশ্ন করেছিল, 'স্যার, আমি শুনেছি আপনার দশ হাজার এক্সপেরিমেন্ট নাকি ব্যর্থ হয়েছে। তবে আপনি সাফল্য অর্জন করেছেন। এডিসন বলেছিলেন, কে বলেছে আমি দশ হাজার বার ব্যর্থ হয়েছি। আমি দশ হাজার বার পরীক্ষা করে সাফল্যের সঙ্গে আবিষ্কার করেছি যে এই পরীক্ষা এইভাবে করা যায় না।

প্রত্যেক ব্যর্থতাই সাফল্যের পথে এক ধাপ সফল পরীক্ষা। তুমি যদি পরীক্ষায় ফেল করো তাহলে ভেবে দেখো এটা তোমার এক ধরনের সাফল্য। সাফল্য এই যে, তুমি জানতে পারলে পড়াশোনায় ফাঁকি দিয়ে, ক্লাসে অমনোযোগী হয়ে বা তুমি যেভাবে উত্তর লিখেছ ওই ভাবে উত্তর লিখে পরীক্ষায় পাস করা যায় না। তোমার পদ্ধতিটা পাল্টাতে হবে।

আমি তাই বলি, কোন মানুষ ভুল করে না। কিছু করার পর সেটি ব্যর্থ হলে তবেই মানুষ বুঝতে পারে পথটি ভুল। একে বলে ঠেকে শেখা বা অভিজ্ঞার মধ্য দিয়ে শেখা। কিন্তু যারা বিজ্ঞ, তারা কিছু শুরু করার আগে অভিজ্ঞ লোকদের কাছ থেকে পরামর্শ নেয়। এই পরামর্শ সফল ও ব্যর্থ উভয় লোকের কাছ থেকেই নিতে হয়। ধরো তোমার একটা এমন অসুখ হয়েছে যে অসুখটা সারছে না। তুমি এমন লোকের পরামর্শ নেবে যার ওই অসুখ হয়েছিল, কীভাবে চিকিৎসা করে তাঁর অসুখ সেরেছিল। তিনিই বলতে পারেন এখন তিনি নিরাময়। আবার যাঁর ওই অসুখ হয়েছে, এখনও সারেনি তাঁর অভিজ্ঞাতও মূল্যবান। তিনি কী ধরনের চিকিৎসা করেছিলেন তা জেনে রাখলে তুমি বুঝতে পারবে ভুল চিকিৎসা কোনটি। তুমি সেই ভুল চিকিৎসকের পাল্লায় পড়বে না।

আমি একটি লেখায় পড়েছিলাম—কারও মধ্যে যদি সৌন্দর্য দেখো তাহলে তা গ্রহণ করো আর যদি না দেখো তাহলে তৈরি করে নাও। অনেক কিছু আমাদের জন্মসূত্রে পাওয়া। আবার অনেক কিছু আমরা প্রচণ্ড উদ্যম ও অধ্যবসায়ের দ্বারা তৈরি করে নিতে পারি। দেশপ্রেম, দয়া, মমতা, মানবতা কর্তব্যপরায়ণতা এসব অর্জন করতে গেলে প্রতিভা লাগে না। যে কোন মানুষই চেষ্টা করলে এসব গুণ অর্জন করতে পারে। আমরা সবাই নেতাজী, স্বামী বিবেকানন্দ বা বঙ্গবন্ধু মুজিবর মহমানের মত প্রতিভা নিয়ে হয়তো জন্মাইনি। কিন্তু আমরা যে কেউই তাদের মত দেশপ্রেমিক হতে পারি। মানুষকে ভালবাসতে পারি।

সাফল্য এবং সুখ দৈবের উপর নির্ভর করে না। নির্ভর করে তোমার পছন্দের উপর। তুমি যেমন বীজ বুনবে, যেমন চাষ করবে, যেমন যত্ন নেবে

তেমন ফসল হবে। ইংরেজরা বলে—তোমার জীবনে যা ঘটেছে সেটাই তোমার ভাগ্যকে যে নির্ধারিত করবে তা নয়। তোমার জীবনে যা ঘটে গেছে তাকে তুমি কেমনভাবে ব্যবহার করছ সেটাই তোমার ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করবে। কত মানুষের জীবনে কত বিপর্যয় ঘটে গেছে কিন্তু তারা সেই বিপর্যয়ে ভেঙে পড়েনি। পঙ্গু গিরি লংঘন করার চেষ্টা করেছে। মূক সরব হওয়ার চেষ্টা করেছে। ডেমেস্থিনিসের মত তোতলা শ্রেষ্ঠ বাগ্মী হয়েছিলেন। গান্ধিজীর মত লাজুক মুখচোরা মানুষ সারা দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আব্রাহম লিঙ্কন, হেনরি ট্রুম্যান (আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট), ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল, ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি নির্বাচনে হেরেছেন। ট্রুম্যান তো দুবার দুবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পরাজিত হন। কিন্তু কেউ হতোদ্যম হননি। যে হেরে গিয়ে, সব ছেড়েছুড়ে বসে পড়ে, ইতিহাস তাকে মনে রাখে না। কত লোক কারাগারের জীবনকেও কাজে লাগিয়েছেন। কারাগারে না গেলে নেহরু তাঁর বিখ্যাত বই ভারত সন্ধানে লিখতে পারতেন না। আমি একজনকে জানি যিনি জেলখানায় দর্জির কাজ শিখে জেলখানা থেকে বেরিয়ে দর্জির দোকান দেন। পরবর্তীকালে তিনি বিরাট ব্যবসার মালিক হন।

ভারত ও বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের জীবনধর্মে উৎসাহিত করার জন্য এই বইটির পরিকল্পনা। শুধু বইতেই উদ্দেশ্য শেষ নয়। নানা ব্যক্তিগত সমস্যার চাপে কোন ছেলেমেয়ের আত্মবিকাশের পথে বাধা পড়ে। তাহলে কী করে সে বাধা অতিক্রম করবে ব্যক্তিগত ভাবে তার পরামর্শ দেওয়ার জন্য লেখক প্রস্তুত। ছয়খণ্ডে লেখা আমার বই হতাশ হবেন না মূলত বয়স্কদের জন্য লেখা। অনেকে আমায় অনুরোধ করেন ছোটদের জন্য এই ধরনের বই লিখুন। আসলে তারাই তো জাতির ভবিষ্যৎ। তাদের উপদেশ শিরোধার্য করেই এই বই-এর অবতারণা। শুধু অনুরোধ, লেখককে চিঠি লিখে উত্তর পেতে গেলে জবাবী খাম দেবে।

শান্তম
বি-সি ১১৮, সল্টলেক
কলকাতা-৭০০ ০৬৪
পার্থ চট্টোপাধ্যায়

।। এক ।।

কে কে বড় হতে চাও?

একদিন এক ইস্কুলের ছেলেমেয়েদের সভায় প্রশ্ন করেছিলাম—কে কে বড় হতে চাও?

প্রশ্ন শুনে সবাই হাত তুলল, আমরা সবাই। সবাই। আমি উত্তর শুনে বললাম, ভেরি গুড। এই তো চাই। বড় হতে গেলে সবার আগে বড় হবার ইচ্ছা থাকা চাই। যেমন দেশবিদেশে যেতে গেলে আগে মনের মধ্যে দেশ ঘোরার ইচ্ছাটা থাকা দরকার।

আমি যখন কলেজে পড়ি তখন একা একা ঘুরে অনেক দেশ দেখে নিয়েছিলাম। আমার এক মামাতো ভাই যখন ইস্কুলে পড়ে তখন থেকেই সে ছুটিতে কখনও কয়েকজন বন্ধু মিলে কখনও একলা সারা ভারত ঘুরেছে। লেখাপড়া শেষ করে সে এখন আমেরিকায় আছে। সেখানেও সে নানা দেশ ঘুরছে।

ছোটবেলা থেকেই আমার ইচ্ছা ছিল আমি একজন লেখক ও সাংবাদিক হবো তারপর সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াব। আবার একটু বেশি বয়সে ভাবলাম সাংবাদিকতা তো অনেক হল এবার পড়াবার চাকরি নিয়ে সাংবাদিক তৈরি করব। আবার লেখক হয়ে ভাবলাম গতানুগতিক কিছু লিখব না—এমন কিছু বই বার করব যা পড়ে ছেলেমেয়েরা উৎসাহ পাবে। তাদের নিরাশা কেটে যাবে। তারা আশার আলো দেখবে। যেই ভাবা সেই কাজ। হতাশ হবেন না বলে একটি সিরিজ করলাম। শত শত মানুষ আমাকে জানিয়েছেন। আপনার বই পড়ে আমরা জীবনে চলার পথ খুঁজে পেয়েছি।

আমার স্বপ্ন সার্থক হল। অথচ আমি খুব গরিবের ছেলে ছিলাম। গ্রাম থেকে পড়াশোনা করেছিলাম। গণিত আর ইংরাজিতে ভাল ছিলাম না। কিন্তু প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে আমার যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল সেগুলি শুধরে নিয়েছি। যেগুলো শোধরাতে পারিনি, এখনও চেষ্টা করে যাচ্ছি। আমার বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে। এই বয়সেও আমি রোজই কিছু না কিছু শিখি। রীতিমত

ছাত্রের মত খাতা-পেন্সিল নিয়ে নোট করি। বিভিন্ন বিষয় বোঝার চেষ্টা করি।

ইচ্ছা বনাম যোগ্যতা :

ইংরাজিতে একটা কথা আছে Frist descrve then desire. আগে দেখো তোমার যোগ্যতা আছে কি না, তারপর কোন কিছু আকাঙ্ক্ষা করবে।

আমি বলতে চাই যোগ্যতা আছে কি না কথাটার অনেক মানে হয়। যোগ্যতা বলতে বোঝায় বিশেষ একটা কিছু করার ক্ষমতা আছে কি না তা দেখা। কিন্তু সবাই যোগ্যতা নিয়ে জন্মায় না। যাঁরা যোগ্যতা নিয়ে জন্মান তাঁদের বলা হয় ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী $\frac{1}{1}$ gifted child. কিন্তু এদের সংখ্যা কোটিতে এক। শঙ্করাচার্য ন' বছর বয়সে বেদ মুখস্ত করে ফেলেছিলেন। বেটোফেন পাঁচ বছর বয়সেই সিম্ফনি রচনা করে ফেলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ন' বছর বয়সে সুন্দর কবিতা লিখে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু জনসংখ্যার তুলনায় gifted child আর কজন? অধিকাংশই সাধারণ মানুষ। তাদের বুদ্ধিবৃদ্ধিও সাধারণ মনের। কেউ হয়তো পড়াশোনায় ভাল ফল করেছে। কিন্তু সব সময় পরীক্ষায় প্রথম হলেই যে সে পরবর্তীকালে জীবনে দাগ রেখে যাবে তা নয়। সারা দেশে প্রতিটি স্কুল থেকে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় গড়ে অন্তত দশজন করে কার্স্ট ডিভিসনে পাস করছে। এর ফলে বছরে এক লক্ষের ওপর ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করা ছেলেমেয়ে বেরুচ্ছে। কিন্তু তারা সবাই কি জীবনে বড় হতে পেরেছে? অনেকেই গতানুগতিক জীবন যাপন করছে।

বড় হওয়া মানে কী? বয়সে বেড়ে ওঠা নয়। মাথায় বেড়ে ওঠা নয়। কোন কিছুতে কৃতিত্ব দেখাতে পারা। একটা কিছু দাগ রেখে যাওয়া। দশজনের মধ্যে এক ডাকে যাতে তোমাকে লোকে চেনে!

আমি মনীষীদের কথা বলছি না। সাধারণ গতানুগতিক মানুষের থেকে ব্যতিক্রমী হওয়াকেই বড় হওয়া বলছি।

যতি বলি ডাঃ ভোলানাথ চক্রবর্তীর নাম শুনেছ? সবাই বলবে শুনিনি আবার। বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ। রাষ্ট্রপতির ডাক্তার। তাঁকে দেখাতে গেলে তিনমাস আগে নাম লেখাতে হয়। অথচ ডাঃ ভোলানাথ চক্রবর্তী তো কোন মহাপুরুষ নন। তিনি মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। আর পাঁচটি বাঙালি ছেলের

মতই মানুষ হয়েছেন।

ব্যবসায়ীদের মধ্যে লর্ড স্বরাজ পালের নাম কে না জানে? তিনি ইংলণ্ডে একজন প্রথম শ্রেণীর ভারতীয় শিল্পপতি। তিনি শিল্পপতি হিসাবে এত বিখ্যাত হয়েছে যে রাণী তাঁকে লর্ড উপাধি দিয়েছেন। স্বাধীনতার পর আর কোন অনাবাসী ভারতীয় এই সম্মান পাননি। অথচ তিনি কিন্তু ব্যবসায়ী হয়ে জন্মাননি। পেশায় তিনি ইঞ্জিনিয়ার। একটু বেশি বয়সেই মেয়ের চিকিৎসার সূত্রে ইংলণ্ড গিয়েছিলেন। মেয়ে মারা গেলে তিনি ইংলণ্ডে থেকে যান ও সাধারণভাবে ব্যবসা গড়ে তোলেন।

সত্যজিৎ রায় একটি বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানে শিল্পী হিসাবে কাজ করতেন। তাঁর খুব ইচ্ছা ছিল নিজে ছায়াছবি করবেন। এজন্য তিনি ছায়াছবি নিয়ে পড়াশোনা করতেন। দেশবিদেশের ছবি দেখে ছবি তৈরি শিখতেন।

এই প্রবল ইচ্ছাশক্তিকে সম্বল করে তিনি বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যয়ের পথের পাঁচালী ছবিটি করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু ছবি করার মত তাঁর টাকা ছিল না। তিনি স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিয়ে কিছু টাকা যোগাড় করে ছবির কাজ শুরু করলেন। কিন্তু টাকার অভাবে ছবির কাজ বন্ধ হয়ে রইল। তখন ডাঃ

বিধানচন্দ্র রায় রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ছবিটি শেষ করার দায়িত্ব নিলেন। ছবি শেষ হল। সারা দুনিয়া জুড়ে হইচই পড়ে গেল। সত্যজিৎ রায় যদি সরকারি অর্ডার পেলে তবে ছবি করবেন বলে বসে থাকতেন তাহলে এত বড় হতে পারতেন না।

আর একজন বিখ্যাত চিত্র পরিচালকের কথা বলি—বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত। ১৯৭৬ সালে আমি কলকাতায় ইস্টার্ন ইন্ডিয়া সেন্টার ফর মাস মিউকমিউকেশন স্টাডিজ বলে একটি সংস্থা করেছিলাম। তখন বুদ্ধদেবের সঙ্গে আমার আলাপ। তিনি তখন সুরেন্দ্রনাথ কলেজে অর্থনীতি পড়ান। কবিতা লেখেন। কিন্তু তাঁর ভীষণ ইচ্ছা তিনি একজন চলচ্চিত্র পরিচালক হবেন। তখন তিনি সবে শরৎচন্দ্রের ওপর একটি তথ্যচিত্র করেছেন। ওই তথ্যচিত্রটি যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিনে নেন তার জন্য আমার সংস্থা কোন সাহায্য করতে পারে কি না এই আবেদন নিয়ে তিনি এসেছিলেন।

আমি দেখেছিলাম ছবি করার জন্য কী ভীষণ আগ্রহ আর আকুলতা তাঁর মধ্যে। তারপর কতবছর কেটে গেছে। নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে তিনি এখন ভারতের দশজন প্রথম সারির ছায়াছবির পরিচালকদের একজন। এটা কী করে সম্ভব হল? সম্ভব হল প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে।

বড় হবার ইচ্ছা থাকলে কোন প্রতিবন্ধকতাই বড় হবার পথ রুখে দাঁড়াতে পারে ন। বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী সুধা চন্দ্রনের দুটো পা দুর্ঘটনায় কাটা গিয়েছিল। কিন্তু তাঁর মধ্যে নৃত্যশিল্পী হবার এমন আকাঙ্ক্ষা ছিল যে তিনি কৃত্রিম কাঠের পা পরে—স্বাভাবিক নৃত্যশিল্পীদের মত নাচ দেখিয়ে অবাক করে দিয়েছেন।

বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ বেটোফেন তাঁর প্রথম সিম্ফনিটি রচনার পর কালা হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি নিজের সৃষ্টি মিউজিক শুনতে পেতেন না। সেই অবস্থাতেই একের পর এক মিউজিক তৈরি করে তিনি বিখ্যাত হন।

বিখ্যাত পদার্থবিদ স্টিফেন হকিং এক দূরারোগ্য অসুখে পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে রয়েছেন। তাঁকে সব সময় বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়। তিনি কথা বলেন যন্ত্রের সাহায্যে। এই অবস্থাতে তিনি বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানের বইগুলি লিখে চলেছেন। সেই সঙ্গে বিজ্ঞানের দুরূহ তত্ত্ব রচনা করে চলেছেন।

আমার দেখা একজন বাঙালি চিকিৎসক ডাঃ অরুণ কুমার দত্তের কথাই বলি। অরুণ বাবু আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে বিলেত থেকে যখন ডাক্তারির সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফেরেন তখন রেটিনার অসুখে তিনি প্রায় অন্ধ হয়ে যান। সেই অবস্থায় তিনি শেঠ সুখলাল কারনানি হাসপাতালে একটি চাকরি পান। তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী অজিত কুমার পাঁজা প্রতিবন্ধী বলে তাঁর জন্য একটি বিশেষ রেকর্ড কিপারের পদ তৈরি করে দেন। ওই পদে চাকরি করে অরুণ বাবু যথাসময় রিটায়ার করেন। কিন্তু অরুণ বাবুর ইচ্ছা ছিল তিনি একজন লেখক হবেন। চোখ খারাপ হবার আগে থেকে তিনি লিখছিলেন। কিন্তু দৃষ্টিহীন হবার পরও তিনি লেখা থামাননি, বরং লেখার পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেন। তিনি মুখে মুখে বলে যান আর একজন সহকারী লিখে নেয়। ওই সহকারীকে নিয়ে তিনি সংবাদপত্র সম্পাদক এবং প্রকাশদের সঙ্গে দেখা করেন ও লেখা সম্পর্কে কথাবার্তা বলেন। তিনি লেখেন ছোটদের গোয়েন্দাকাহিনী ও নানা ধরনের গল্প। এছাড়া প্রতিবছর কিশোরদের গল্প সংকলন সম্পাদনা করেন। ট্রামে বাসে যাতায়াত করেন এবং কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফেল করেন না।

মানুষের অদম্য ইচ্ছাশক্তিকে কখনও দমিয়ে রাখা যায় না। অনেকের ছোটবেলায় বাবা-মা মারা যায়। অল্পবয়সে অভিভাবকহীন হয়ে পড়লে অনেক ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যায়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতা দাদাভাবই নৌরজির যখন চার বছর বয়স তখন তাঁর বাবা মারা যান। গরিব

বিধবার ছেলে দাদাভাই নৌরজি এই অবস্থায় এতবড় হলেন কী করে? লোকমান্য তিলক ১৬ বছর বয়সে তাঁর বাবাকে হারান। সত্যজিৎ রায় যখন মাতৃগর্ভে তখন তাঁর বাবা বিখ্যাত লেখক ও কবি সুকুমার রায় মারা যান। দার্শনিক বেকন আঠারো বছর বয়সে বাবাকে হারান। কিন্তু চরম দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁকে কাটাতে হয়।

আমি সারা পৃথিবীর অন্তত কয়েক হাজার কৃতী মানুষের নাম বলে দিতে পারি যারা শৈশবে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন কাটিয়েছেন। আবার বহু প্রতিবন্ধীর নাম করতে পারি যাঁরা যে কোন সুস্থ লোককে প্রতিযোগিতায় হারিয়ে সফল হয়েছেন।

১৯৭৯ সালে ১১ বছর বয়সে ট্রেন দুর্ঘটনায় দুটো পা হারান মাসুদুর রহমান নামে এক বাঙালি যুবক। এই অবস্থায় তিনি সাঁতার শেখেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল তিনি একদিন ইংলিশ চ্যানেল পার হবেন। ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসে তাঁর সে স্বপ্ন সফল হয়। তিনি ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী হন। তার কয়েক বছর আগে জার্মান মহিলা লুমিনা ১২ ঘন্টা ২৯ মিনিটে ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়েছিলেন। তাঁর দুটো পা গোড়ালি থেকে কাটা ছিল।❑

।। দুই ।।

আকাশ যাদের সীমা

বড় হওয়া কাকে বলে?

এই প্রশ্নের উত্তর আগে একবার দিয়েছি। আবার দিচ্ছি। বড় হওয়া মানে হল এক ডাকে যাতে লোকে চেনে। চিন্তু শুধু চিনলেই হবে না, লোকে তো চোর ডাকাতদেরও এক ডাকে চেনে। তা নয়, তাদের প্রতি সাধারণ মানুষের একটি শ্রদ্ধাও থাকতে হবে।

যদি কেউ অসৎপথে বড়লোক হয়, দেশের ও দশের উপকারে সে না লাগে তাহলে তাকে বড়লোক বলতে পারি কিন্তু বড়মাপের মানুষ বলব না। প্রচুর ধনবান না হয়েও শুধু চরিত্রের জোরে কোন মানুষ বড় মানুষ বলে সম্মান পেতে পারে। আবার যদি কোন মানুষ রাষ্ট্রক্ষমতার শীর্ষে চলে যান, প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির জোরে সমস্ত বাধাকে এড়িয়ে সাফল্যের দরজায় গিয়ে পৌঁছন তাহলে তাঁকে নিশ্চয়ই কৃতী মানুষ বলব সে অর্থে হিটলার মুসোলিনি স্তালিন সকলেই কৃতী মানুষ। কৃতিত্বের শিখরে উঠে এঁরা মানবতাবিরোধী আচরণ করেছেন বলে সমানভাবে ধিকৃত হয়েছে। কিন্তু সেটি তাঁদের চরিত্রের দুর্বলতার দিক। তাঁদের সাফল্যের দিক হল অতি সাধারণ অবস্থা থেকে তাঁরা এক একটি দেশের সর্বময় কর্তা হয়েছেন। স্তালিন ছিলেন এক গরিব মুচির ছেলে। মুসোলিনি এক মধ্যবিত্ত ইস্কুল মাস্টার। আর হিটলার? ১৯০৭ সালে হিটলার ভিয়েনা অ্যাকাডেমিতে ভর্তির জন্য দরখাস্ত করেছিলেন। কিন্তু তাঁকে যোগ্যতা নেই বলে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তিনি বেকার অবস্থায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন। শীতের সময় গৃহহীনদের শেলটারে রাত কাটাতেন। জার্মানির রাস্তায় শীতের সময় বরফ পরিষ্কার করার জন্য শ্রমিকের দরকার হত। হিটলার সেই বরফ পরিষ্কারের কাজ করতেন।

কিন্তু হিটলারের বুকের মধ্যে স্বপ্ন লুকিয়ে ছিল, তিনি বিরাট কিছু করবেন। তিনি ভেঙে পড়েননি। সারা জীবন শ্রমিকের কাজ করে হাহুতাশ করে একদিন মারা যাননি।

ভারতে মুগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর একজন ছোট্ট জমিদার ছিলেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। ধীরে ধীরে তিনি রাজ্য জয় করতে শুরু করেন। কিন্তু কাজটা খুব সহজ ছিল না। এমন অবস্থা গেছে যে তাঁর অনুগত সব সেনা তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু বাবর হাল ছাড়েননি। এবার হাল ছাড়েননি বলেই তিনি পরবর্তীকালে ভারতসম্রাট হয়েছেন।

একবার সাফল্য এসে গেলেই যে তাকে আর পিছনে তাকাতে হবে না এটা ঠিক নয়। Nothing Succeeds like success এই ইংরেজি প্রবচনটি সব সময় খাটে না। আরতি সাহা একবার ইংলিশ চ্যানেল জয়ী হয়েছিলেন কিন্তু তারপরে আর একবার চেষ্টা করেছিলেন, পারেননি। ১৯৯৫ সালে পঃ বঙ্গে মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিল সঞ্জীব বসাক। সে ছিল বন্ধ কারখানার এক শ্রমিকের ছেলে। অনেক কষ্ট করে লেখাপড়া করতে হত তাকে। কিন্তু উচ্চমাধ্যমিকে সঞ্জীব ফার্স্ট বা সেকেন্ড হতে পারল না। সেবার উচ্চ মাধ্যমিকে যে প্রথম হয় সে পায় ৯৩৬। সঞ্জীব পেয়েছিল ৭৭৬। আমি অসংখ্য ছেলেমেয়ে দেখেছি মাধ্যমিকে প্রথম বিভাগে পাস করে কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিকে দ্বিতীয় বিভাগ পেয়ে যায়।

স্কুলে ক্লাস সেভেন পর্যন্ত যে ছেলেমেয়ে প্রথম হত সে এইট নাইনে উঠে পিছিয়ে পড়ে। এজন্য কোন সাফল্যেই আত্মসন্তুষ্ট থাকতে নেই। সাফল্যকে মনে করতে হয় বিরাট চ্যালেঞ্জ, বরাবর সাফল্যকে টিকিয়ে রাখার চ্যালেঞ্জ। এজন্য প্রচুর খাটতে হয়।

যাঁদের নাম হয়ে গেছে তাঁদের দায়িত্ব আরও বেড়ে যায়। এ যেন তারের ওপর দিয়ে চলা। একটু অসতর্ক হলেই পিছলে পড়তে হবে। আবার অন্য কিছু কারণের জন্যও সফল মানুষের জীবনেও ব্যর্থতা আসতে পারে। যেমন চিত্রতারকা অমিতাভ বচ্চন ব্যবসা করতে গিয়ে লোকসানের ধাক্কায় পড়লেন। পাওনাদাররা তাঁর সম্পত্তি ক্রোক করে নিল। কিন্তু তার জন্য আমরা কি বলব তিনি ব্যর্থ? মোটেই না। পতন-অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়েই মানুষকে চলতে হয়। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে চ্যালেঞ্জ হল পতনকে তিনি কি ভাবে গ্রহণ করছেন তার ওপর। ব্যর্থতাকেও হাসিমুখে গ্রহণ করতে হয়।

আমি দুবার চাকরি খুয়েছি। চাকরি হারিয়ে কত লোক আত্মহত্যা করে। আমার এক নিকট আত্মীয় চাকরি হারিয়ে এমন মানসিক অবসাদে ভুগছিল যে

পাঁচ ছ'বছর সে আর চাকরির চেষ্টা না করে বাড়ি বসেছিল। আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা করত না।

নেপোলিয়নকে শেষ জীবনে একটি দ্বীপে বন্দী হয়ে থাকতে হয়েছিল। অসীম সাহসী বীর প্রতাপাদিত্যকে খাঁচার ভেতর বন্দী করে মানসিংহ দিল্লি নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথেই তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু তার জন্য তাঁদের বীরত্ব কি ম্লান হয়েছে এতটুকু? মোটেই তা হয়নি। সাফল্য এবং ব্যর্থতা যেন একটি মুদ্রার এপিট আর ওপিঠ। আজ যিনি স্বাস্থ্যবান, কাল তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মত সাত্ত্বিক মহাপুরুষেরও হঠাৎ ক্যান্সার হল। অমন স্বাস্থ্যবান স্বামী বিবেকানন্দ ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে পড়লেন এবং অসুখে ভুগে মাত্র ৩৯ বছর বয়সে মারা গেলেন।

সুনাম অর্জন করতে বছরের পর বছর লাগে। কিন্তু এক নিমেষের মধ্যেই দুর্নাম অর্জন করা যায়। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিন ধরে আলাপ ছিল। আমি তাঁকে একজন সৎ ও দক্ষ সরকারি অফিসার বলে জানতাম। একদিন খবরের কাগজে দেখলাম আয়করের লোকেরা তাঁর বাড়ি হানা দিয়ে প্রচুর কালো টাকা উদ্ধার করেছে। নিমেষের মধ্যে ভদ্রলোকের সারাজীবন ধরে অর্জিত সুনাম চলে গেল। টাকা তিনি আরও রোজগার করতে পারেন কিন্তু সুনাম আর ফিরে পাবেন না।

তাই বড় হতে গেলে সব সময় সতর্ক থাকতে হয় যাতে সম্মানহানি না হয়। কারণ সম্মানই বিশিষ্ট মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ।

আলামোহন দাস, হর্ষদ মেহতা কত কষ্ট করে সাধারণ অবস্থা থেকে বড় হয়েছেন। আলামোহন দাস কপর্দক শূন্য অবস্থা থেকে বড় শিল্পপতি হন। হাওড়ার কাছে দাসনগর তাঁরই নামে হয়েছে। কিন্তু একটি ফৌজদারি মামলায় জড়িয়ে পড়ে আলামোহন দাসের বিশাল কৃতিত্বে একটি কালির দাগ লেগে গেল। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী হিন্দুজাদের বিরুদ্ধে বফর্স মামলায় দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে। অনেক মানুষ বহু কষ্ট করে, পরিশ্রম করে বড় হন। কিন্তু সতর্ক হয়ে না চলার ফরে তাঁদের নামে নানা কলঙ্ক রটতে থাকে। সেজন্য বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক থাকতে হয়।❑

।। তিন ।।

কেন পান্থ

ছোটবেলায় হয়তো এই কবিতাটি পড়েছ কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘপথ। উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ। আমি অনেক ছেলেমেয়ের মধ্যে সুপ্ত প্রতিভা দেখেছি। কিন্তু তাদের উদ্যম নেই।

আমি একশ টাকা বেতনে চাকরি শুরু করি। কিছুদিন আগে একটি ছাত্রীর জন্য কলকাতায় একটি কোম্পানিতে শিক্ষানবিসির ব্যবস্থা করে দিলাম। ছ'মাসের জন্য তাকে দেড় হাজার টাকা হাতখরচ দেওয়া হবে। সাফল্যের সঙ্গে শিক্ষানবিস করলে সে নিয়োগপত্র পাবে। তখন বেতনও বাড়বে। মেয়েটি এই বেতনে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে রাজি হল না। তার দুদিন পরে একটি ছেলে চাকরির জন্য এল আমার কাছে। ছেলেটি ফিজিক্সে প্রথম শ্রেণীর অনার্স। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এম বি এ। সেখানেও প্রথম শ্রেণী। সে চারমাস দিল্লিতে থেকে চাকরির সন্ধান করছিল। আমায় বলল; দিল্লিতে সবাই অভিজ্ঞতা চাইছে। দু'বছরের অভিজ্ঞদের চাকরি আছে। আমাকে তাই যেকোন ভাবে চাকরিতে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। আমায় কাজটা দিন।

এই দুইজনের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কত তফাৎ। শেষের ছেলেটির নাম ভাস্কর। আমার ধারণা সে বড় হবে কারণ সে বাস্তববাদী এবং কঠোর জীবন সংগ্রামে ভয় পায় না। আমি বহু বড় বড় অফিসারদের সাধারণভাবে জীবন শুরু করতে দেখেছি।

আমার বন্ধু সুভাষ সরকার দক্ষিণপূর্ব রেলের একজন মস্ত অফিসার। সুভাষ কত কষ্ট করে লেখাপড়া শিখেছে। সে দিনে সাধারণ চাকরি করত আর নাইট কলেজে পড়ত। এইভাবে সে আই এ এস পরীক্ষা দেয়। ও রেলের অফিসার গ্রেডে চাকরি পায়। অনেক আই এ এস অফিসার প্রথমে ডব্লু বি সি এস অফিসার হয়ে ঢোকেন। পশ্চিমবঙ্গের একজন প্রাক্তন চিফ সেক্রেটারি সাধারণ চাকরিতে জীবন শুরু করেছিলেন। পরে তিনি পরীক্ষা দিয়ে আই এ

এস হন। বহু কলেজের লেকচারার পরীক্ষা দিয়ে আই এ এস আই পি এস হয়েছেন। সাংবাদিক সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত যিনি এখন একটি সাপ্তাহিকের মালিক সম্পাদক তিনি একসময় কেরানি হিসাবে জীবন শুরু করেন।

সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ এক সময় বাস কন্ডাকডারি করতেন। সমরেশ বসু কারখানার শ্রমিক ছিলেন। যাদু সম্রাট হুডিনি বুদাপেস্তের রাস্তায় রাস্তায় খবরের কাগজ বিক্রি করতেন। জুতো পালিশ করতেন। পরে তিনি একটি লগেজের দোকানে কাজ পান। ওই লগেজের দোকানে কাজ করতে করতে তিনি বন্ধ স্যুটকেশ খোলার ম্যাজিক আবিষ্কার করেন। এর পরে একটি দর্জির দোকানে কাজ নেন। দিনে কারখানায় কাজ করতেন ও রাতে ম্যাজিক দেখাতেন।

অনেকের মধ্যে এই ধারণা আছে বড় বড় ইস্কুলে পড়লেই বুঝি বড় মাপের মানুষ হওয়া যায়। অনেকে একথাও ভাবে যে গরিবের ছেলেমেয়েরা কোনও দিনই বিখ্যাত হতে পারে না। তারা চিরদিন অখ্যাত থেকে যায়।

আমি তোমাদের এক গরিবের ছেলের গল্প বলছি—দারিদ্র্য তাঁর প্রতিভা বিকাশের পথে কখনও বাধা হয়নি। এর একটা বড় কারণ প্রবল মনের জোর।

আমি যাঁর কথা বলছি তিনি হলেন বিখ্যাত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র। দীনবন্ধু অনেক ভাল ভাল নাটক লিখেছেন, যেমন—সধবার একাদশী, জামাই বারিক, কবিতা লিখেছেন সুরধুনী কাব্য। কিন্তু তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন 'নীলদর্পণ' নাটক লেখার জন্য।

১৮৬০ সালে 'নীলদর্পণ' নাটকটি প্রকাশিত হয়। সেসময় বাংলা বিহার ওড়িশাতে বিদেশি বণিকেরা জোর করে চাষীদের দিয়ে নীলের চাষ করাতো। নীল গাছের ছাল থেকে তৈরি হত নীল রঙ। ওই নীল বিদেশে চালান দিয়ে প্রচুর টাকা লাভ করত বণিকরা।

ধান বা পাট না বুনে সে জমিতে নীলের চাষ করায় চাষীদের ক্ষতি হত। তাছাড়া সাহেব নীলকররা তাদের ন্যায্য পারিশ্রমিকও দিত না। শেষ পর্যন্ত অত্যাচার অসহ্য হয়ে ওঠায় চাষীরা বিদ্রোহ করে। ওই বিদ্রোহের নাম 'নীল বিদ্রোহ'।

দীনবন্ধু মিত্র সরকারি চাকরি করতেন। তাই কস্যচিৎ পথিকস্য নামে তিনি নীলদর্পণ নাটকটি লেখেন। ওই নাটকে তিনি বাংলার এক নিরীহ চাষী

পরিবারের ওপর নীলকরদের অত্যাচারের কথা ফুটিয়ে তোলেন। মাইকেল মধুসুদন দত্ত নীলদর্পণ ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। পাদ্রী জেমস লঙ সাহেব ইংরেজি নীলদর্পণ প্রকাশ করায় তাঁকে জরিমানা দিতে হয়েছিল।

এই দীনবন্ধু মিত্রের ছোটবেলায় নাম ছিল গন্ধর্বনারায়ণ। ১৮৩০ সালে নদীয়া জেলার চৌবেড়িয়া গ্রামে দীনবন্ধুর জন্ম হয়।

ছোটবেলায় তাঁকে আর পাঁচটা ছেলের মত গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি করে দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁদের বাড়ির অবস্থা ভাল ছিল না। পাঠশালায় সামান্য লেখাপড়া শেখার পর তাঁকে তাঁর বাবা জমিদারি সেরেস্তায় খাতা লেখার চাকরিতে ঢুকিয়ে দেন। কিন্তু গন্ধর্বনারায়ণের স্বপ্ন আমি বড় হবো। খাতা লিখে এভাবে নিজেকে নষ্ট করবে কেন?

গন্ধর্বনারায়ণ একদিন তাই পালিয়ে চলে এলেন কলকাতায় তার কাকার বাড়ি। কাকার অবস্থাও এমন কিছু ভাল নয়। কাকা বললেন, গন্ধর্ব তুই এভাবে পালিয়ে চলে এলি। তোকে আমি খেতে দেব কি করে?

গন্ধর্ব বলল, কাকা আমি তোমাদের বাড়ি বাসন মাজব। আমায় একটু থাকতে দাও। তোমার পায়ে পড়ি।

কাকা ভাইপোর কথা ঠেলতে পারলেন না, গন্ধর্ব সেদিন থেকে কাকার বাড়ির থেকে গেলেন। সে সময় কলকাতায় পাদ্রী লঙ সাহেবের ইস্কুল ছিল। পয়সা লাগত না। গন্ধর্বনারায়ণ তাঁর নামটি পালটে করলেন দীনবন্ধু। এই নামে ভর্তি হলেন লঙ সাহেবের ইস্কুলে। সেখানে থেকে হেয়ার সাহেবের ইস্কুল। বৃত্তি নিয়ে পাস করে তারপর ভর্তি হলেন হিন্দু কলেজে। খুবই ভাল ছাত্র ছিলেন দীনবন্ধু। কিন্তু আর্থিক অবস্থা এমনই শোচনীয় হয়ে দাঁড়াল যে দীনবন্ধু আর বি.এ. পরীক্ষা দিতে পারলেন না। দেড়শ টাকা মাইনেয় পাটনায় পোস্টমাস্টারের চাকরি নিয়ে চলে গেলেন।

কিন্তু দীনবন্ধুর ছোটবেলা থেকে ছিল সাহিত্যপ্রীতি। ছোটবেলায় তখনকার দিনের সেরা কাগজ 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখতেন। চাকরি জীবনের ব্যস্ততার মধ্যেও সে সাহিত্য সাধনা থেকে বিচ্যুত হননি।

আর একজন গরিবের ছেলের কথা শোনাই। তোমরা নোবেল পুরস্কারের নাম শুনেছ নিশ্চয়ই। আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ, বৈজ্ঞানিক সি ভি রমণ, মা টেরেসা যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। এই নোবেল পুরস্কার যাঁর নাম আলফ্রেড নোবেল। পৃথিবী বিখ্যাত বিজ্ঞানী। ডিনামাইট আবিষ্কার করে তিনি

বিখ্যাত হন।

এই আলফ্রেড নোবেল জন্মেছিলেন নরওয়ে দেশের রাজধানী স্টকহোম শহরে ১৮৩৩ সালে। একটি ছোট্ট বাড়ির পিছন দিকের ঘরে তাঁর জন্ম। জন্মের সময় তাঁর বাবা দেউলিয়া হয়ে যান। ছোটবেলায় তিনি খুব রোগা আর দুর্বল ছিলেন। বাবা মনের দুঃখে বাড়ি ছেড়ে চাকরির সন্ধানে অন্য দেশে চলে গিয়েছিলেন। তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে আলফ্রেডের মাকে খুব কষ্টে সৃষ্টে সংসার চালাতে হত।

বিখ্যাত ব্রিটিশ সাহিত্যিক এইচ. জি. ওয়েলস খুব গরিবের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। গরিবের ছেলে বলে ওয়েলসকে সবাই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করত। একদিন ওয়েলস যখন বয়সে কিশোর, সে সময় জমিদারের এক ছেলে তাঁকে উঁচু করে ধরে শূন্যে ছুড়ে দেয়। মাটিতে পড়ে গিয়ে ওয়েলস প্রচণ্ড আঘাত পান। তাঁর পা জন্মের মত খোঁড়া হয়ে যায়।

কিন্তু পা ভেঙে তিনি যখন বাড়িতে শুয়েছিলেন তখন পাড়ার একজন তাঁকে কিছু বই পড়তে দেয়। ওই বই পড়তে পড়তে তিনি নতুন জ্ঞানের জগতের সন্ধান পেয়ে যান। সেদিন থেকেই তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, আমি বড়ো হবো। কিন্তু দারিদ্র্যের জন্য তাঁর পড়াশোনা বেশিদূর এগুলো না। চোদ্দ বছর বয়সে স্কুল ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। চাকরি নিলেন একটি ছোট্ট কোম্পানিতে। ক্যাশিয়ার অর্থাৎ হিসাব রাখার চাকরি। কিন্তু এ চাকরি তাঁর ভাল লাগল না। কীভাবে চাকরি ছাড়বেন সেটা যখন ভাবছেন ঠিক সেই সময় মালিকই তাঁকে চুরির বদনাম দিয়ে চাকরি ছাড়িয়ে দিলেন।

সেসময় ওয়েলসের বাবা রোগশয্যায় পঙ্গু। আর মা এক বড়লোকের বাড়িতে ঝি-গিরি করেন। মা আবার ছেলের রুজিরোজগারের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ভাবলেন ছেলেকে কম্পাউন্ডারি শেখাবেন। তাঁকে একটি পরিচিত ডাক্তারখানায় কাজ শেখাতে পাঠালেন। কিন্তু একাজ তাঁর ভাল লাগল না।

এরপর চার বছর ধরে কাজ করলেন এক জামা-কাপড়ের দোকানে। কিন্তু একাজও ভাল লালগ না। একদিন পালিয়ে গেলেন দোকান থেকে।

ওয়েলসের ছোটবেলা থেকে পড়াশোনায় আগ্রহ ছিল। তাঁর বাড়ির লোকেরা তাঁকে খুঁজে পেতে এনে বসিয়ে দিলেন এক বৃত্তি পরীক্ষায়। এই পরীক্ষায় পাস করে তিনি বৃত্তির টাকায় পোড়াশোনা চালাতে লাগলেন।

স্কুলের পড়া শেষ করে তিনি পোস্টমাস্টারের চাকরি নিলেন। কয়েক

সপ্তাহ পরে একাজও তাঁর ভাল লাগল না। তিনি আর একটি কাজ নিলেন। আর শুরু করলেন লেখালেখি।

কিন্তু কিছুদিন পরেই ফুটবল খেলতে গিয়ে তিনি আঘাত পেলেন কিডনিতে। অসুস্থ অবস্থায় চলে গেলেন মায়ের কাছে। বেশ কিছুকাল ঘরে বন্দী থাকা অবস্থায় তিনি আবার বেশি করে লেখালেখি শুরু করলেন।

একটু সেরে ওঠার পর পকেটে মাত্র ৮ পাউন্ড নিয়ে তিনি চলে আসেন লন্ডন শহরে। একটি কলেজে চাকরি নিলে আর লেখালেখি চলতে লাগল। এই চাকরি করতে করতেই তিনি বি.এস-সি. পরীক্ষায় পাস করলেন। তাঁর বিখ্যাত বই 'টাইম মেশি' ১০০ পাউন্ডে কিনে নিল লন্ডনের সে সময়কার বিখ্যাত পত্রিকা পলমল গেজেট। এইচ. জি. ওয়েলস এরপর থেকে লেখক হিসাবে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যান।

ছোটবেলায় পড়াশোনায় ভাল না হলে বড় হয়ে সে যে ভাল হবে না, তার কোন মানে নেই। ক্রমাগত চেষ্টা আর কঠোর পরিশ্রম করে যে কেউ যে কোন বয়সেই নিজেকে বদলাতে পারে।

অনেককাল আগে ভারতবর্ষে পাণিনি নামে এক বিরাট সংস্কৃত পণ্ডিত বাস করতেন। তিনি কোন সময়কাল লোক এ নিয়ে নানা মতভেদ আছে। তবে যিশু খ্রিষ্ট জন্মাবার প্রায় চারশ থেকে পাঁচশ বছর আগে প্রাচীন ভারতবর্ষে তিনি জন্মেছিলেন। পাণিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন সংস্কৃত ভাষায় ব্যাকারণ লেখার জন্য।

ছোটবেলায় কিন্তু তাঁকে দেখে বোঝা যায়নি যে তিনি বড় হয়ে এতবড় পণ্ডিত হবেন। পড়াশোনাতেও তিনি খুব সাধারণ ছিলেন।

একবার এক জ্যোতিষী তাঁর হাত দেখে বলেছিলেন, তাঁর হাতে বিদ্যারেখাই নেই। সুতরাং পাণিনির ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

কথাটা শুনে পাণিনির খুব জেদ চেপে গেল। হাতে রেখা নেই বলে আমার কিনা লেখাপড়া হবে না। আমি যদি চেষ্টা করি আমায় আটকায় কে দেখি। আর মানুষ নিজেই ভাগ্যকে গড়ে নিতে পারে।

পাণিনি করলেন কি, একটা ছুরি দিয়ে হাতটা চিরের একটা রেখা বার করে নিয়ে জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে বললেন, এই দেখুন, আমার বিদ্যারেখা আমি নিজেই তৈরি করে নিয়েছি। এইবার বলুন তো, আমার লেখা পড়া হবে কি না।

জ্যোতিষী তো দেখে হতবাক।

তারপর থেকে পাণিনি সব ছেড়ে দিয়ে মন দিয়ে পড়াশোনা করতে লাগলেন। পড়াশোনাই হল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান।

সংস্কৃত ভাষায় তিনি বিরাট পণ্ডিত হয়ে উঠলেন। তৈরি করলেন সংস্কৃত ভাষার এক সংক্ষিপ্ত ও সহজ ব্যাকরণ যার নাম অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ। আটটি অধ্যায় বলে তার নাম অষ্টাধ্যায়ী। আর পৃথিবীতে কোন্ ভাষাতেই এ পর্যন্ত এত সহজ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ তৈরি হয়নি।

এবার আর একজন বিখ্যাত লোকের কথা বলি, ছোটবেলায় তিনিও পড়াশোনায় একদম ভাল ছিলেন না। তাঁর নাম জর্জ ব্যনার্ড শ। শ জন্মসূত্রে আইরিশ অর্থাৎ আয়ার্ল্যান্ডের লোক। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের তিনি একজন। নাটক লিখে তিনি নোবেল প্রাইজ পান।

আয়ার্ল্যান্ডের রাজধানী ডাবলিন শহরে ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই জর্জ ব্যনার্ড শ এর জন্ম। তাঁর বাবা খুব ভাল মানুষ ছিলেন। ছোটখাটো ব্যবসা করে কোনরকমে দিন চালাতেন। ব্যনার্ড শ-এর পরিবার ছিল খুব গরিব। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার দিকেও বাবা খুব একটা নজর দিতেন না।

ছোটবেলায় ডাবলিনের একটি সাধারণ স্কুলে জর্জকে ভর্তি করা হল। পড়াশোনায় খুবই সাধারণ একটি ছেলে। মাস্টারমশাইদেরও নজর কাড়ার মত কিছুই ছিল না তার মধ্যে।

স্কুল জীবনে দাগ কাটার মত কিছুই রেখে যেতে পারেননি জর্জ। তিনি খেলাধুলাও পছন্দ করতেন না। পড়াশোনাতেও মন ছিল না। আবার তেমন মেধাবীও নন। পরীক্ষার ফল করেছিলেন সাধারণ। শুধু ছোটবেলা থেকে ছিল তাঁর বই পড়ার নেশা।

কোন রকমে ইস্কুলের পড়া শেষ করে জমির দালালের অফিসে শিক্ষানবিশ হিসাবে চাকরিতে ঢুকলেন। কিন্তু কাজটি তাঁর ভাল লাগছিল না। চলে এলেন লন্ডনে।

লন্ডনে এসে তিনি ঠিক করলেন একজন বড় লেখক হবেন। পাঁচ-ছটি উপন্যাস লিখে সেগুলি ছাপার জন্য প্রকাশকের দরজায় দরজায় ঘুরলেন। কিন্তু কেউ তাঁর উপন্যাস ছাপাতে রাজি হল না। প্রথম দিকে তার লেখা নাটকগুলি থেকেও তিনি একটি পয়সাও পাননি। পরবর্তীকালে ব্যনার্ড শ খ্যাতির চূড়ায় উঠেছিলেন, যশ অর্থ, প্রতিপত্তি কিছুরই তাঁর অভাব ছিল না।

কিন্তু তিনি যদি চেষ্টা না চালিয়ে যেতেন এবং কিছু হল না বলে হাল ছেড়ে দিতেন তাহলে আমরা আর নোবেল বিজয়ী জর্জ ব্যনার্ড শ-কে পেতাম না।

জীবনে নানা বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করে শুধু একাগ্রতার জোরে মানুষ কীভাবে তার লক্ষ্য সাধনের পথে এগিয়ে যেতে পারে এমন অসংখ্য উদাহরণ আছে। তোমাদের তা থেকে শুধু কয়েকটি উদাহরণ দিই।

হায় করে কেটে গেছে মহাভারতের কাল।

কিন্তু অর্জুনের মত লক্ষ্যের প্রতি স্থির দৃষ্টি রেখে এ কালেও বহু মানুষ তাঁদের জীবনের উদ্দেশ্য পূরণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

এ যুগের অর্জুনদের মধ্যে দুজনের গল্প শোনাই। একজনের কথা বিদ্যাসাগর মশাই লিখে গেছেন। তাঁর নাম উইলিয়াম গিফোর্ড।

তিনি একজন বিরাট পণ্ডিত বলে বড় হয়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর মশাই লিখছেন, ইংলন্ডের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত মানুষ মারা যান। সহায় সম্পত্তি কিছুই ছিল না। বিশ বছর পর্যন্ত তিনি খুব কষ্ট পেয়েছেন। লেখাপড়া শেখার মত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তা আর তাঁর কপালে হয়ে উঠল না।

গিফোর্ডের বাবা যখন মারা যান তখন গিফোর্ডের বয়স তেরো। তখন তাঁদের এক আত্মীয় কার্ল হিল এসে গিফোর্ডের মাকে বলল, গিফোর্ডের বাবা তাঁর কাছে কিছু টাকা ধার করেছিলেন। এবার টাকাটা ফেরত দাও। গিফোর্ডের মা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আমার তো কিছু নেই বাবা।

তখন কার্লহিল বলল, তাহলে তোমার যে সব সম্পত্তি আছে এগুলো আমাকে দিয়ে দাও। তোমার ছেলে গিফোর্ডকে আমি লেখাপড়া শেখাবো।

কার্লহিল এইভাবে সম্পত্তিগুলো নিয়ে নিলেন। গিফোর্ডকে ইস্কুলে ভর্তি করে দিলেন। কিন্তু চার মাসের মধ্যেই তাকে ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনে ছাসবাসের কাজে লাগিয়ে দিলেন।

এক দুর্ঘটনার ফলে গিফোর্ডের বুকে ব্যথা লাগে। গিফোর্ড তাই মাঠে কাজ করতে পারতেন না। কার্লহিল তখন গিফোর্ডকে আর এক জায়গায় চাকরি করতে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু যে গিফোর্ডকে চাকরিতে নেবে বলেছিল, সে লোকটি পরে পিছিয়ে যাওয়ায় গিফোর্ডের আর সেখানে যাওয়া হল না। কার্লহিল তখন গিফোর্ডকে এক জাহাজের কাজে ঢুকিয়ে দিলেন ওই

জাহাজে গিফোর্ডকে খুব কষ্ট দিত। জাহাজে যারা মাছ বিক্রি করতে যেত সেই জেলের বউরা গিফোর্ডের কষ্টের কথা শুনে সবাইকে বলত আহা রে, দুধের ছেলেকে অমন কষ্ট দিচ্ছে। কথাটা কার্লহিলের কানে যেতেই তিনি গিফোর্ডকে চাকরি ছাড়িয়ে বাড়ি নিয়ে আসেন। গিফোর্ডকে ভর্তি করে দেওয়া হয় স্কুলে।

গিফোর্ডের ভাগ্য এরপর ঘুরে গেল। তিনি অল্পদিনের মধ্যে পড়াশোনা শেষ করে অন্য ছাত্রদের পড়াবার কাজ নিলেন। কিন্তু কার্ল হিল সব শুনে বললেন, আমি আর তোমার দায়িত্ব নিতে পারব না। তোমাকে একটি জুতোর দোকানে ভর্তি করে দিচ্ছি।

এক বছর জুতোর দোকানে কাজ করলেন গিফোর্ড। সে সময় একজন তাঁকে একটি পুরনো বীজগণিতের বই পড়তে দেন। কিন্তু এর আগের খণ্ডটি না পড়লে বীজগণিত বুঝতে পারবেন না। খণ্ডটি প্রভুর ছেলের আগের কাছে ছিল। কিন্তু সে বইটি লুকিয়ে রাখত। গিফোর্ড বইটি চুরি করে বার করে পড়ে ফেললেন। একটু অঙ্কর করার মত কাগজ কলমও তাঁর কাছে ছিল না। কাগজের অভাবে তিনি চামড়া ঘষে তেল কাগজ করে নিতেন। তার ওপর ভোতা আল দিয়ে লিখতেন। কিন্তু এটাও করতে হত গোপনে। এইভাবে খুব কষ্ট করে পড়াশোনা করে দুবছরের মধ্যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার মত করে নিজেকে উপযুক্ত করে তুললেন।

কুকস্লি নামে এক দয়ালু ভদ্রলোক তাঁকে সাহায্য করতেন। কিন্তু কিছুদিন পরে কুকস্লি মারা গেলেন। কিন্তু তাতে গিফোর্ডের খুব অসুবিধা হল না। গ্রাসবিনর নামে আর একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি গিফোর্ডকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। গিফোর্ড এরপর লেখাপড়া শিখে একজন নামকরা বিদ্বান লোক বলে গণ্য হয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর মশাই লিখে গেছেন, মানুষের যদি বড় হবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকে তাহলে তাকে কোনও বাধা টলাতে পারে না। তার সহায়-সম্পদও জুটে যায়। সুতরাং তোমরা যদি সত্যি সত্যি বড় হতে চাও, তোমার মনের মধ্যে যদি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকে দেখবে কোনও বাধাই বাধা বলে মনে হবে না।

পড়াশোনার জগৎ থেকে এবার আসি খেলার রাজ্যে।

বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড়, ফুটবলের রাজা ম্যারাদোনার গল্প নিশ্চয়ই শুনেছ। ১৯৮৬ সালে বিশ্বের সেরা এগারজন ফুটবল খেলোয়াড়দের মধ্যে

ম্যারাদোনা ছিলেন একজন। ওই বছর তিনি বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতায় সেরা ফুটবল খেলোয়াড়ের সম্মান লাভ করেন।

কিন্তু এই সম্মান পাবার পিছনে ছোটবেলা থেকে তাঁর যে কি প্রচণ্ড উদ্যোগ আর অধ্যবসায় ছিল তা অনেকেই জানে না। সেই সঙ্গে লক্ষ্যর প্রতি স্থির ছিলেন তিনি।

ম্যারাদোনর বাড়ি ছিল আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েন্সএয়ার্স শহরে, বাড়ির অবস্থা ভাল না। বাবা কারখানার সামান্য শ্রমিক। থাকতেন গরিবদের পাড়ায়। তাঁর ডাক নাম দিয়াগো। কিন্তু ম্যারাদোনার ছোটবেলা থেকে উৎসাহ ছিল ফুটবলে। বাবার তো ফুটবল কিনে দেবার মত টাকা ছিল না। তাই কাগজের বল তৈরি করে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে খেলতেন। বাবা ছেলের উৎসাহ দেখে একদিন চামড়ার বল কিনে দিলেন। ম্যারাদোনার উৎসাহ আরও বেড়ে গেল।

সেই সময় দিয়াগোর খেলার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে গেল এক ভদ্রলোকের কানে কথাটা যেতেই তিনি একদিন এলেন দিয়াগোর খেলা দেখতে। দেখে খুব ভাল লাগল। ভদ্রলোক দিয়াগোকে নিয়ে গেলেন নিজের ক্লাবে খেলার জন্য। দিয়াগোর বয়স তখন আট নয়।

ক্লাবের কর্তারা খুব বেঁকিয়ে বলল, এই পুঁচকে ছেলেটা কি খেলবে?

ভদ্রলোক বললেন, দেখই না একটু সুযোগ দিয়ে। নিমরাজি হয়ে দিয়াগোকে খেলায় সুযোগ দেওয়া হল। দারুণ খেলল দিয়াগো। কালক্রমে সে হয়ে উঠল দলের এগারজনের একজন। দিয়াগোর জন্য সেই দল আর্জেন্টিনার জুনিয়র চাম্পিয়ন হল। তখন দিয়াগো আর্মান্ডো ম্যারাদোনার বয়স মাত্র ১৩। তার খেলা দেখে মুগ্ধ হয়ে একটি নাম করা ক্লাব অনেক টাকা দিয়ে ম্যারাদোনাকে নিয়ে নিল। ৪০টি ম্যাচে ২৮টি গোল করে ম্যারাদোনা রেকর্ড করল।

আর ক'বছর পরে ম্যারাদোনার এমন নাম হয়ে গেল যে স্পেনের বিখ্যাত বার্সিলোনা ক্লাব ন'কোটি টাকা ফি দিয়ে ম্যারাদোনাকে স্পেনে নিয়ে যায়। এরপর ম্যারাদোনাকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।

আমি সব সময় আমার দুই মাস্টার মশাই সত্যরঞ্জন বাবু ও ব্রজেন্দ্র বাবুর কথা বলি। এই দুই মানুষের কাছে আমি ব্যক্তিগতভাবে ঋণী।

সত্যরঞ্জন বাবু ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে চাকরি করতে চলে যান। কোন

চাকরিতেই পাকাপোক্ত হতে পারেননি। তারপর তিনি আমাদের স্কুলে কেরানির চাকরি নেন। সে সময় তিনি টিউশনি শুরু করেন। তিনি ভোর পাঁচটা থেকে পড়াতে বসতেন। চাকরি করে বাড়ি ফিরে আবার টিউশনি করতেন। এর মাঝে তিনি প্রাইভেট ইন্টারমিডিয়েট বিকম ও এম কম পাস করেন। পরবর্তীকালে তিনি কলকাতার কলেজে এম কম এর অধ্যাপক হন। টিউশনির টাকায় তিনি দোতলা বাড়ি করেন।

ব্রজেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য প্রাইভেটে সব পরীক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেরানির চাকরি করতেন। পরে প্রমোশন পেয়ে পাবলিকেশন অফিসার হন। চল্লিশ বছর বয়সে এম পাস করে তিনি আমাদের কলেজে অধ্যাপক হয়ে আসেন। সে সময় তিনি একটি বিখ্যাত সাপ্তাহিকের সম্পাদনাও করতেন।

আগেকার দিনে টাকা পয়সার অভাবে অনেক গরিব ছেলেমেয়ের লেখাপড়া বেশিদূর এগুতে পারত না। কিন্তু যাঁরা সত্যিকারের প্রতিভাবান বা যাদের মধ্যে সৃজনশীল ক্ষমতা আছে তাঁদের বড় হওয়ার পথে প্রথাগত শিক্ষার অভাব কোন প্রতিবন্ধকতাই হত না। আবার অনেকে ইচ্ছা করেই প্রথাগত শিক্ষা গ্রহণ করেননি। যেমন রবীন্দ্রনাথ। তিনি স্কুলের শিক্ষা সম্পূর্ণ করে কোন সার্টিফিকেট নেননি। তাঁকে ননম্যাট্রিক বলা যায়। আবার বাবা জেলে থাকায়, মা অসুস্থ হওয়ায় ইন্দিরা গান্ধীর আর গ্রাজুয়েট হওয়াই হয়ে ওঠেনি।

বিখ্যাত ডিটেকটিভ গল্প লেখিকা আগাথা ক্রিস্টির কোন প্রথাগত শিক্ষা ছিল না। আগাথা ৮৫ বছর বয়স পর্যন্ত ১১০টি বেস্টসেলার গোয়েন্দা উপন্যাস লিখেছেন। তিনি বই লিখে ১৫ কোটি টাকা আয় করেছেন। তাঁর স্লিপিং মার্ডার বইটির পেপার ব্যাক কপিরাইট ৭৫ লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়। বিখ্যাত পক্ষী বিশেষজ্ঞ সেলিম আলিও ম্যাট্রিক পাস করেননি। তাঁর দাদার কাঠের ব্যবসা ছিল। দাদার ব্যবসায়ে যোগ দিয়ে তিনি বার্মার জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন। কিন্তু জঙ্গলে ঘুরে কাঠ দেখার বদলে তিনি দেখতেন নানা ধরনের পাখি। দাদার ব্যবসা ফেল পড়ায় ফিরে এসে দশ বছরের অভিজ্ঞতার ফলে তিনি একজন পক্ষী বিশেষজ্ঞ হয়ে যান। মুম্বই যাদুঘরে তিনি দর্শকদের পাখি সম্পর্কে লেকচার দিতেন। তাঁর ইচ্ছা হল তিনি পক্ষীতত্ত্ব পড়বেন। ছুটি নিয়ে তিনি জার্মানিতে পক্ষীতত্ত্ব পড়তে যান। ফিরে এসে দেখেন তাঁর পদটি

তুলে দেওয়া হয়েছে। সে সময় একটি পক্ষীতত্ত্ববিদের চাকরির বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ডিগ্রি নেই বলে তিনি পদটি পাননি।

এরপর তিনি সরকারের কাছে একটি প্রকল্প দেন সারা ভারতে তিনি যত পাখি আছে তার ওপর সমীক্ষা চালাবেন। এই প্রকল্পে তাঁকে কাজ দেওয়া হয় ও তিনি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাখি বিশেষজ্ঞ হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন।

বিশ্ববিখ্যাত যাদুকর প্রদীপ কুমার সরকারের ইন্দ্রজাল তোমরা দেখেছ। প্রদীপ একজন উচ্চশিক্ষিত যাদুকর। সে মনোবিজ্ঞানের এম এসসি। কিন্তু বিগতদিনের বিখ্যাত যাদুকর হুডিনি যাঁকে যাদু সম্রাট আখ্যা দেওয়া হয়েছিল তিনি প্রথাগত শিক্ষা পাননি। কিন্তু তাতে তাঁর যাদুসম্রাট হওয়া আটকায়নি। আকবর প্রথাগত শিক্ষা পাননি, কিন্তু সম্রাট হিসাবে তিনি গ্রেট বা মহান বলে অভিহিত হয়েছেন। ভারতের ইতিহাসে দুজন মাত্র রাজাকে এই উপাধি দেওয়া হয়েছে। সম্রাট অশোক আর আকবর। আকবর রাজা হিসাবে যেমন শ্রেষ্ঠ ছিলেন, বিচক্ষণ ও উদার মানুষ বলেও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন।

কোন মানুষ যদি অন্য সবদিকে ব্যর্থ হয়েও শুধু মানুষ হিসাবে সফল হয় তাহলে তার জন্ম সার্থক। বহু সাধুপুরুষকে দিয়ে সাংসারিক কাজকর্ম করানো যায়নি। কবি রামপ্রসাদ একজন হিসাব-রক্ষক হিসাবে সফল ছিলেন না। কিন্তু কবি ও ভক্ত মানুষ হিসাবে লোকে এক বাক্যে তাঁর নাম করে। রামপ্রসাদী গান আজও অমর হয়ে রয়েছে। রবার্ট ব্রুসের গল্প সকলেরই জানা। একুশবার চেষ্টা করার পর তিনি হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করতে পেরেছিলেন।

সকলের প্রথম দিকের প্রচেষ্টা সফল হয় না। অসমের গুয়াহাটিতে অয়েলফিল্ড টাইমস বলে একটি দৈনিক পত্রিকার মালিক বিজয় নাথের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। বিজয়বাবু শিলচর থেকে প্রকাশিত যুগশঙ্খেরও মালিক। তিনি অসমের একজন কৃতী বাঙালি ব্যবসায়ী। কিন্তু তিনি আমাকে বলেছেন, তিনি অনেক ব্যবসা শুরু করেছিলেন। কিন্তু প্রথম দিকে একদম সফল হতে পারেননি। কিন্তু তিনি ব্যবসা ছেড়ে দেননি। অবশেষে যুগশঙ্খ পত্রিকাটি তাঁকে সাফল্যের পথ দেখায়।

আমার এক উদ্যমী ছাত্র আছে। তার নাম অনুপম অধিকারী। অনুপম অনেক ম্যাগাজিন সম্পাদনা করেছে। কিন্তু কোন ম্যাগাজিনই বেশি দিন চলেনি। সে ওই সব ম্যাগাজিনের মালিক ছিল না। সেজন্য তার অসুবিধা হয়েছে। সে যা চেয়েছে মালিক তা চায়নি। আমায় অনুপম বলল, স্যার,

বারবার ঘা খেতে খেতে আমি ঠিক করলাম, আমি এলাইন ছাড়ব না। এর শেষ দেখব। আমি নিজে কাগজের মালিক হয়ে তবেই কাগজ বার করব।

সত্যি সত্যি অনুপম এখন নিজে একাধিক কাগজের মালিক। সে দরগা রোড়ে একটি বহুতল বাড়ির একটি ফ্ল্যাট কিনে সেখানে তার ছাপাখানা বসাচ্ছে। এটাও হুডিনির ম্যাজিকের মত। উদ্যমী মানুষ এক পুরুষেই ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে শিক্ষাগ্রহণ করে সফল হতে পারে।

বিখ্যাত গুঁড়ো সাবান নির্মা প্রথমে খুব ছোট্ট কুটির শিল্প হিসাবে শুরু হয়েছিল। বিখ্যাত সংবাদ এজেন্সি রয়টারের গোড়াপত্তন হয়েছিল দুটি ছোট্ট ঘরে। রয়টার সাহেব আর তার পত্নী এই দুজন মাত্র কর্মী ছিলেন। পৃথিবীর বিশজন ধনী ব্যক্তির একজনের নাম বিল গেট। মাইক্রোসফট কোম্পানির মালিক। তিনিও কোন প্রথাগত শিক্ষা নেননি। তিনি ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলেও নন। ২০ বছর বয়সে বাল্যবন্ধুর সঙ্গে মিলে মাত্র দশ হাজার ডলার মূলধন দিয়ে তিনি সফটওয়ার কোম্পানি গড়ে তোলেন। ২৩ বছরে তাঁর সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ২ লক্ষ ৫৪ হাজার কোটি টাকা।

অতদূর যেতে হবে কেন, কলকাতার রাজেশ চোপড়া কেরানির চাকরি করতেন। চাকরি ছেড়ে সফটওয়ার শিখে তিনি এখন বিরাট ব্যবসার মালিক। তিনি এখন লক্ষ লক্ষ ডলার রোজগার করছেন।

বড় হতে গেলে দরকার পরিশ্রম ধৈর্য, সংযম আর বিচক্ষণতা। শুধু বুদ্ধি দিয়ে হয় না। দুষ্টবুদ্ধিও বুদ্ধি। একজন সিঁদেল চোরের বুদ্ধি সাধারণ মানুষের থেকে বেশি। একজন পকেটমার যে ঝুঁকি নেয় একজন সাধারণ মানুষ তো নিতে পারে না। একজন মুটে যে পরিশ্রম করে সাধারণ মানুষ তার সিকিভাগও করে না। কিন্তু তারা কি সফল? মোটেই নয়। তারা হয় ধিকৃত। না হয় উপেক্ষিত। কারণ তাদের সাফল্য ইতিবাচক জীবনবাদের উপর ভিত্তি করে না। বিচক্ষণতাই বুদ্ধিকে সুপথে এবং সঠিকপথে চালিত করতে পারে। তখন মানুষ যে শ্রম করে সেই শ্রম সার্থক হয়।

তাছাড়া মানুষের গোটা জীবনটাই হল এক্সপেরিমেন্ট। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে একটু একটু করে এগুতে হয়। তাই সাময়িক ব্যর্থ হলে ভেঙে পড়তে নেই। বার বার চেষ্টা করে যেতে হয়। ওয়াল্ট ডিজনি আমেরিকার ক্যানসার সিটিতে প্রথম যে কার্টুন কোম্পানি করেছিলেন সেটি ফ্লপ করে। ২১ বছর বয়সে একটি ভাঙা সুটকেশ নিয়ে তিনি হলিউডে আসেন। সেখানে

অ্যালিস ইন ওয়ন্ডারল্যান্ড নিয়ে তিনি কার্টুন ছবি করেন। এ ছবিটিও চলেনি। তাতেও না দমে তিনি এরপর মিকিমাউস কার্টুন ছবি তৈরি করেন। মিকিমাউস তাঁকে প্রচুর খ্যাতি এনে দেয়। এ পর্যন্ত ১০০ কোটি দর্শক ডিজনির ছবিগুলি দেখেছেন। আমেরিকার দুটি শহরে ডিজনি তৈরি করে গেছেন অফুরন্ত আনন্দের উৎস ডিজনিল্যান্ড। এ পর্যন্ত দুকোটির ওপর লোক ডিজনিল্যান্ড পরিদর্শন করেছে।

এলাম দেখলাম জয় করলাম এমন ঘটনা কম ঘটে। পৃথিবী বীরভোগ্যা। উদ্যমশীল মানুষদের জন্যই পৃথিবী।❑

।। চার ।।

উদ্যমী পুরুষসিংহ

ছোটবেলায় সংস্কৃত শ্লোক পড়েছিলাম ঘুমন্ত সিংহের মুখে কখনও পশু প্রবেশ করে না। সিংহকেই উঠে তৎপর হয়ে শিকার ধরতে হয়।

তোমরা যত যোগ্যই হও, যদি ভাবো বাড়ি বয়ে কেউ তোমাকে চাকরি বা অর্থ দিয়ে যাবে তাহলে বুঝতে হবে তোমরা মূর্খ। যাঁরা নোবেল পুরষ্কার পান তাঁদেরও পুরস্কার পাবার জন্য উদ্যমী হতে হয়। সব সময় মনে রাখবে ভারতবর্ষ বিশাল দেশ। তুমি যত প্রতিভাবান হও না কেন, তোমার মত প্রতিভা গড়াগড়ি খাচ্ছে। তাই প্রতিভার সঙ্গে উদ্যমও থাকতে হয়। কত লোক পরীক্ষায় ভাল রেজাল্টা না করেও বড় চাকরি করছে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র জীবনযুদ্ধে তলিয়ে যাচ্ছে। এসবই হয়েছে উদ্যমের জন্য। শুধু প্রতিভা থাকলে হয় না, উদ্যম চাই। কখনও আশা কোর না যে লোকে তোমার খোঁজে আসবে। নিজেকে প্রথমে যোগ্য করে তুলতে হবে। তারপর সেই যোগ্যতাকে প্রথম দিকে ফিরি করে করে বেড়াতে হবে। নিজেকে সমাজে পরিচিত করে তুলতে হবে। তুমি যে যোগ্য লোকে লোকে জানবে কী করে? এজন্য বিশিষ্ট মানুষজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে হবে।

আর হাল ছাড়রে চলবে না। কত লোক যা আরম্ভ করে তা শেষ করে না, আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করো, যা শুরু করবে তা শেষ করবে। যা শেষ করতে সামর্থ্যে কুলবে না তা শুরু করবে না। উদ্যম অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারে। শুধুমাত্র উদ্যমের জোরে কীভাবে জগদীশচন্দ্র আচার্য জগদীশচন্দ্রে পরিণত হয়েছিলেন সে কথা বলি।

বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর নাম তোমরা সবাই শুনেছ। যিনি গাছেরও প্রাণ আছে এই বৈজ্ঞানিক সত্য প্রতিপন্ন করেছিলেন। এই জগদীশচন্দ্র ছাত্রাবস্থায় দীর্ঘকাল ধরে কালাজ্বরে আক্রান্ত হন। কিন্তু জ্বরে পড়ে থেকেও তিনি হতোদ্যম হননি। তিনি তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে গেছেন।

জগদীশচন্দ্রের স্বপ্ন ছিল লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ডাক্তারি পড়ার। কিন্তু তাঁর বাবার আর্থিক সঙ্গতি ছিল না। তাই তাঁর সঙ্কল্প পরিত্যাগ করতে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর জননী বামাসুন্দরী তাঁকে বলেন, তোর খুব ইচ্ছে বিলেন যাবার। কিন্তু তোর বাবার টাকা নেই। কিন্তু আমার গায়ের অনেক গহনা আছে। আর আমার নিজের কিছু টাকাও আছে। আমার গহনাগুলো বেচে তোকে টাকা দেবো, তুই কিছু ভাবিসনে।

অবশ্য মায়ের গহনা বিক্রি করতে হয়নি। জগদীশচন্দ্রের বাবা ভগবানচন্দ্র নিজেই টাকার সংস্থান করেছিলেন। কিন্তু যাত্রার বেশ কিছুকাল আগে তিনি আসামে এক বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে গিয়ে কালাজ্বরে পড়লেন।

কোনরকমে কলকাতায় এসে পৌঁছলেও তার জ্বর সারল না। এদিকে বিলেত যাত্রার সময় এসে উপস্থিত হল। যাত্রা বুঝি বানচাল হয়ে যায়। কিন্তু জগদীশচন্দ্র বললেন, তিনি বিলেত যাবেনই। জ্বর গায়ে তিনি বিলেত যাত্রা করলেন।

ভেবেছিলেন, জাহাজে সমুদ্রের হাওয়ায় বুঝি তাঁর জ্বর ছেড়ে যাবে। কিন্তু জ্বর ছাড়ল না। বরং ডেকের ওপর তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। জাহাজের সব যাত্রী বলাবলি করতে লাগল ছেলেটি বোধহয় আর লন্ডন পৌঁছাতে পারবে না।

ইংলন্ডে পৌঁছলেন। ডাক্তারিতে ভর্তি হলেন। এক বছর কেটে গেল। তাও জগদীশচন্দ্রের জ্বর ছাড়ল না। এই এক বছরের ওপর তিনি জ্বর গায়ে পড়াশোনা চালিয়ে গেছেন। শেষে এমন অবস্থা হল যে তার শারীরবিদ্যার অধ্যাপক রায় দিলেন জগদীশচন্দ্রকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হওয়া দরকার। আর ডাক্তারি পড়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

জগদীশচন্দ্র লন্ডন হাসপাতালে ভর্তি হলেন। চিকিৎসকরা তাঁকে আর্সেনিক ইঞ্জেকশন দিলেন। অর্থাৎ কালাজ্বর চিকিৎসার শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করা হল। তবু তাঁর জ্বর ছাড়ল না।

জগদীশ কিন্তু দেশে ফিরে আসেননি। ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দিতে হল বলে বরং তাঁর শাপে বর হল। তিনি ক্রাইস্ট কলেজে একটি বৃত্তি নিয়ে বিজ্ঞান পড়তে চলে গেলেন।

এখানে গিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল। তবে একেবারে নয়—মাঝে মাঝে জ্বর আসতে লাগল। এই অবস্থায় জগদীশচন্দ্র পড়াশোনা চালিয়ে শরীর চর্চার

দিকে মন দিতে লাগলেন। ক্ষুধাও বাড়ল। শরীর সবল হয়ে উঠল। তবু তাঁর জ্বর একেবারে ছাড়ল না। এক বছর পরে তবে জ্বর ছাড়ল। কিন্তু দেখা দিল নিদ্রাল্পতা। রাতে তাঁর ঘুম হত না। কিন্তু তার মধ্যেও তিনি পড়াশোনা চালিয়ে গেছেন। শুধু প্রবল মনের জোরে সমস্ত বাধা অতিক্রম করে কেমব্রিজ থেকে পাস করে চার বছর পরে তিনি দেশে ফেরেন।

আজ আমরা যে বাংলা ছাপার হরফ ব্যবহার করছি তা তৈরি হয় কম্পিউটরে। কিন্তু কম্পিউটর আসার আগে সীসার হরফ ব্যবহার করা হত। দুশো বছরের সামান্য কিছু আগে বাংলায় কোন ছাপা হরফ ছিল না। এই ছাপার হরফ, বাংলা বই ও বাংলা দেশে ইস্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যাঁর নাম জড়িয়ে আছে সেই উইলিয়ম কেরীর জীবনের উদ্যমের কথা বলি।

শ্রীরামপুর গেলে দেখবে শ্রীরামপুর কলেজ আর শ্রীরামপুর মিশন।

কলকাতার খুব কাছেই শ্রীরামপুর। একসময় এই শহরটি ছিল বিদেশি দিনেমারদের অধীনে। ডেনমার্কের লোকদের দিনেমার বলে।

আঠারো শতকে ইংরেজরা এসে যখন বাংলা-বিহার-ওড়িশার অধিপতি হয়ে বসল তখন বাংলার চন্দননগরা ছিল ফরাসিদের হাতে আর শ্রীরামপুর দিনেমারদের হাতে।

সে সময় ইংরেজরা কোনও খ্রিস্টান মিশনারিকে ইংরেজ রাজত্বে এসে ধর্মপ্রচার করতে দিত না। তাদের ধারণা ছিল তাতে করে ভারতবাসীর সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাবে। এ কারণে ইংল্যান্ড থেকে একদল মিশনারি এসে কলকাতায় দিনেমারদের রাজ্য শ্রীরামপুরে মিশন তৈরি করেছিল। শ্রীরামপুরের এই মিশটি আজও আছে। এর প্রতিষ্ঠাতা উইলয়ম কেরি।

শ্রীরামপুরের মিশনটির নাম ব্যাপ্টিস্ট মিশন। এঁরা খ্রিস্টানদেরই একটি সম্প্রদায়। এঁদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের মাধ্যমে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেওয়া।

কিন্তু শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশনকে শুধু একটি ধর্ম প্রচারক মিশন বললে ভুল হবে। ঊনিশ শতকে বাংলায় যে নবজাগরণ ঘটেছিল এই মিশন তাতে অনেকখানি সাহায্য করেছি। মিশনারিরা ছাপাখানা তৈরি করেন। পঞ্চানন কর্মকার নামে এক কারিগরকে দিয়ে প্রথম বাংলা টাইপ ছেনি কেটে কেটে তৈরি করান। বিভিন্ন বিষয়ে বাংলা বই প্রকাশ করেন ও প্রথম বাংলা

সংবাদপত্রিকা সমাচার দর্পণ প্রকাশ করেন।

আর এই বিরাট কাজে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন উইলিয়ম কেরি। বিরাট পণ্ডিত ছিলেন তিনি। বহু ভাষা জানতেন তার মধ্যে একটি ভাষা বাংলা। তিনি বাংলা ভাষায় বই লিখেছেন, অনুবাদ করেছেন আর ছাত্রদের হর্টিকালচারাল সোসাইটির যে বিখ্যাত ফুলের বাগানটি আছে ওই বাগান আর শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন তাঁর নিজের হাতে গড়া।

কেরি ছিলেন একজন বড় সমাজ সংস্কারক। রাজা রামমোহন রায়েরও আগে তিনি সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন।

এই যে এত বড় মানুষটি তিনি কিন্তু নিজেকে তিল তিল করে তৈরি করেছিলেন।

ছোটবেলা থেকেই তাঁর ছিল জ্ঞানের পিপাসা। যেখানে যা দেখতেন সব কিছুই তিনি জানতে চাইতেন। আর শিখতে চাইতেন ভাষা। নিজে চেষ্টা করে ছোটবেলা থেকে শিখে ফেলেছিলেন গ্রিক, লাতিন, গণিত ও নানা ধর্মশাস্ত্র। জীববিজ্ঞান আর ভ্রমণ কাহিনী পড়তেও খুব ভালবাসতেন। কিন্তু লেখাপড়া শেখার এত আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তাঁকে বারো বছর বয়সে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হয়। তাঁর বাবা ছিলেন খুব গরিব। ছেলের পড়াশোনার খরচ যোগাবার মত টাকা তাঁর ছিল না।

অতএব খুড়ো পিটারের সঙ্গে উইলিয়ম কেরিকে পাঠানো হল চাষাবাদের কাজ শিখতে। কিন্তু অতটুকু ছেলে চাষের মত খাটনির কাজ পারবে কেন? তাই শরীরে সইলো না। তখন এক মুচির কাছে গেলেন জুতো সেলাই শিখতে। সারা সপ্তাহ ধরে জুতো তৈরি আর মেরামত করে রবিবার খদ্দেরদের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হত জুতোগুলো।

ওই জুতোর দোকানে কাজ করতে করতে এক সহকর্মী বন্ধুর কাছে প্রায়ই ধর্মকথা শুনতেন। শুনতে শুনতে ধর্ম সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ জন্মে যায়।

২৭ বছর বয়সে তিনি জুতো সেলাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে এক পাঠশালায় পড়াবার চাকরি নেন। এই সময় তিনি তিনটি বিদেশি ভাষা শিখে ফেলেন। তিন বছর শিক্ষকতা করার পর তিনি শিক্ষকতার কাজ ছেড়ে ধর্মযাজকের কাজ নেন।

ধর্ম প্রচারের উদ্দেশে তিনি একটি সংঘ তৈরি করে। ওই সংঘ থেকে ঠিক হয় তিনি খ্রিস্টধর্ম প্রচার করতে আফ্রিকা যাবেন। সে সময় টমাস নামে

এক চিকিৎসক ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে গিয়েছিলেন। বাংলাদেশ ঘুরে তিনি দেশে ফিরলে কেরির সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়।

কেরি তাঁর কাছে শোনেন ভারতবর্ষ ধর্ম প্রচারের পক্ষে উপযুক্ত জায়গা। কেরি তখন মত পালটে ভারতে যাওয়াই ঠিক করেন। ঠিক হয় টমাসও সঙ্গে যাবেন।

এদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে তাঁরা ভারত যাত্রার অনুমতি যোগাড় করতে পারেন না। কিন্তু কেরি তাতে বিন্দুমাত্র দমলেন না। বিনা অনুমতিতেই তিনি ভারতে যাবেন ঠিক করেন। কিন্তু ছাড়পত্র ছাড়া কোন জাহাজ তাঁকে নিতে রাজি হয় না। অবশেষে একটি দিনেমার জাহাজ তাঁদের জায়গা দেয়। সে সময় পাঁচ মাস লাগত বিলেত থেকে জাহাজে করে ভারত আসতে। ওই পাঁচ মাসে কেরি টমাসের কাছ থেকে বাংলা শিখে নেন।

কেরি ও টমাস এসে নেমেছিলেন কলকাতায়। ছাড়পত্র না থাকায় কোনও অসুবিধা হয়নি। জাহাজঘাটে আলাপ হয় এক বাঙালি মুন্সির সঙ্গে। তাঁর নাম রামরাম বসু। রাম রাম বসু ছিলেন একজন বাংলা পণ্ডিত। পরে বাংলা গদ্য বই লিখে খুব নাম করেছিলেন। কারণ তখনও বেশি গদ্যের বই ছিল না।

প্রায় ছ'বছর ধরে বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে এক প্রান্ত ঘুরে বহু দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে কেরি শ্রীরামপুরে আশ্রয় পান। সেখানে গড়ে তোলেন তাঁর মিশন।

আলস্য হচ্ছে উদ্যমের পয়লা নম্বর শুরু। ছোটবেলা থেকে আলস্য পেয়ে বসলে বড় হলে আর পরিশ্রমী হওয়া যায় না।

আলস্য বা কুঁড়েমি ভাঙতে গেলে প্রথমে দরকার ভোরবেলা ওঠা অভ্যাস করা। প্রথম প্রথম ভোরে ওঠা কষ্টকর বলে মনে হবে। কিন্তু আমাদের শরীরের ভেতর একটা অ্যালার্ম ঘরি আছে। কিছুদিন ধরে অভ্যাস করলে ঘড়িই ঠিক কাজ ঠিক সময় করিয়ে দেবে। মাসখানেক যদি ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে শোও তাহলে দেখবে একমাস পরে তুমি ওই সময়ই উঠছ। মনের ভেতরকার ঘড়ি তোমার অজান্তে কাজ করে চলেছে। ভোরে ওঠা একবার অভ্যাস হয়ে গেলে দেখবে ভোরে বিছানা ছেড়ে না উঠলে সারাদিনটা খারাপ যাচ্ছে।

আমি যখন মাঝে মাঝে দেশবিদেশে যাই তখন খুব ভোরে ট্রেন বা প্লেন

ধরতে হয়। যদি শেষ রাতে ঘুম না ভাঙে তাই আমি হোটেলে বলে দিই আমাকে জাগিয়ে দিও। সেইসঙ্গে আমার মনের ঘড়িতেও অ্যালার্ম দিয়েছি। অ্যালার্মের নিয়মটা হচ্ছে মনে মনে বলতে হবে, কাল রাত তিনটেয় তোমায় উঠতে হবে। বুঝলে মশায়। নইলে প্লেন মিস করলে যাচ্ছেতাই কাণ্ড হবে। ব্যস, এই কথা বলে ঘুমিয়ে পড়তে হবে। তারপর দেখবে ঠিক রাত তিনটেয় ঘুম ভেঙে যাচ্ছে।

আমি যদিও বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে হোটেলে বলে রেখে দেই যে আমাকে অমুক সময় তুলে দিও, কিন্তু আমার মনের ঘড়ি সঠিকভাবে কাজ করে। দেখা যায়, ওদের ডাকার আগেই আমি উঠে পড়েছি।

আমার এমন অভ্যাস হয়ে গিয়েছে যে রোদ্দুর উঠে গেলে আমি আর বিছানায় শুয়ে থাকতে পারি না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভোরের রবি ওঠার আগেই ঘুম থেকে উঠে পড়তেন। একবার ভারি মজা হয়েছিল। কবি গিয়েছেন নরওয়েতে। সেখানে মধ্যরাতেই সূর্য উঠে যায়। কবির ঘুম ভেঙে গেল মাঝরাতেই। আসলে সূর্যের আলোর সঙ্গে মনের অনুষঙ্গ হয়ে গিয়েছে। রোদ উঠলেই আর বিছানায় পড়ে থাকতে ইচ্ছা করবে না।

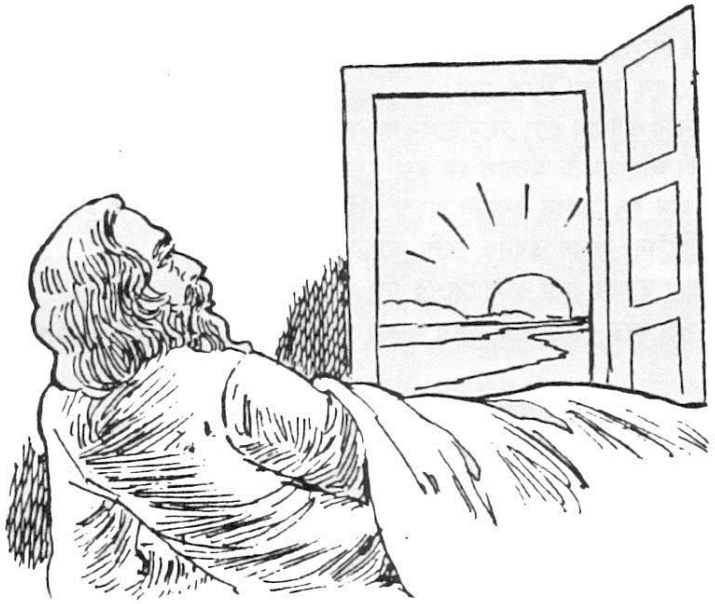

আমি একবার সাইবেরিয়ার তুন্দ্রা অঞ্চলে গিয়েছিলাম। সেখানে গ্রীষ্মকালে সারারাত দিনের আলো থাকে। আমি ঘড়ি দেখে রাত এগারটায় ঘুমিয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুম আর আসে না। একটু তন্দ্রাভাব এল। কিন্তু ঘুর ভেঙে দেখি চারিদিকে দিনের আলো। ঘড়িতে দেখলাম রাত তিনটে বাজে। যে কদিন ছিলাম ওই দেশে সে কয়রাত আর ঘুম হয়নি।

ভারতে এক এক জায়গায় এক এক সময় সূর্যোদয় হয়। আমি কিছুদিন যাবৎ অসমে আছি। এখানে সবার আগে সূর্য ওঠে। আবার পাঞ্জাবে দেখেছি বর্ষাকালে রাত নটা পর্যন্ত রোদ্দুর থাকে। কিন্তু ভোরের আলো ফুটতে দেরি হয়। তবে ভারতে সব জায়গাতেই একই টাইম। যেটা রাশিয়া ও আমেরিকাতে হয় না। সেখানে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সময়ের হেরফের হয়। সময় নির্ভর করে সূর্যোদয়ের ওপর। আমাদের দেশে শীতকালে সূর্য দেরি করে ওঠে। শীতের সময় দিন ছোট। তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা হয়ে যায়। যদি শীতকালের জন্য টাইম আলাদা হত তাহলে দিন বড় বলে মনে হত। অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটাকে যদি আধঘন্টা পিছিয়ে দেওয়া যেত তাহলে সূর্যের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যেত। কিন্তু যাঁরা উদ্যোগী মানুষ, জীবনে শৃঙ্খলা মেনে চলেন। তাঁরা শীত হোক, গ্রীষ্ম হোক একই সময় মেনে চলেন। কাশীতে দেখেছি শীতের ভোরে কত সাধু গঙ্গাস্নান করছেন। এটা করা যায় অভ্যাসের দ্বারা। শরীরের নাম মহাশয়। যা সহাবে তাই সয়। অর্থাৎ একটু একটু করে সব কিছুই অভ্যাস করা যায়। তুমি যদি ৫০ গ্রাম করে ভার তুলতে শুরু করো এবং ধীরে ধীরে ভার বাড়িয়ে যাও দেখবে দুবছর পরে তুমি অক্লেশে ৫০ কেজি ভার তুলতে পারছ।

ভোরে ওঠার অভ্যাস যাদের নেই, যারা সকালে আটটার আগে বিছানা ছেড়ে উঠতে চায় না, তাদের যদি ভোর পাঁচটায় উঠতে বলা হয়, পারবে না। তাদের রোজ ১৫ মিনিট করে আগে ওঠার অভ্যাস করতে হবে। ভোর পাঁচটায় ওঠা অভ্যাস করতে বারো থেকে পনেরো দিন লাগবে। তা এক মাসই লাগুক ধীরে ধীরে এগুলো দেহের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। প্রথম প্রথম ভোরবেলা উঠতে গেলে খুব খারাপ লাগবে কিন্তু বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হবে খোলা মাঠে।

ভোরবেলা বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ প্রচুর থাকে। এছাড়া ভোরের বাতাসে থাকে স্বাস্থ্যকর ওজন গ্যাস। ভোরে উঠে জোরে জোরে হাঁটলে খুব

ভাল ব্যায়াম হয়। কিশোর ও যুবকদের পক্ষে জগিং বা ধীরে ধীরে দৌড়ানোর মত ভাল ব্যায়াম আর নেই।

তাছাড়া কেউ যদি নির্ধারিত সময়ের চেয়ে রোজ একঘন্টা আগে ঘুম থেকে ওঠে তাহলে সে প্রতিদিন একঘন্টা করে সময় বাঁচাচ্ছে। অর্থাৎ বছরে ৩৬৫ ঘন্টা অর্থাৎ পনেরো দিন। বহুলোক বছরে এক মাস অতিরিক্ত ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেন।

সংসারে নেতিবাচক লোকের অভাব নেই। নিজের ভাল পাগলেও বোঝে। কিন্তু এই নেতিবাচক লোকেরা তা বোঝে না। তারা সব কিছুই প্রতিবাদ করে বসে। কোন ভাল কথাই কানে নেয় না।

একবার এক মাস্টারমশাই তার এক ছাত্রকে উৎসাহিত করার জন্য ভোরে ওঠার সপক্ষে অনেক যুক্তি দিলেন। তারপর বললেন জানো, আমি ভোরে উঠে বেড়াতে বেরোই। একদিন বেড়াতে গিয়ে একটি লোক রাস্তায় এক থলি মোহর পেয়েছিল। ভোরে উঠত বলেই তো পেল।

ছাত্রটি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল স্যর যে মোহরের থলিটি ফেলে গিয়েছিল সে না জানি আরও কত ভোরে উঠে বেড়াতে বেরিয়েছিল।

মাস্টারমশাই চুপ।

না, তর্ক করলে হবে না। আমি আমার পাঠকদের বলি, দ্যাখো। আমি যে সব কথা বলি তা আমার উপকারের জন্য নয়, তোমার উপকারের জন্য। রোগ সারাতে গেলে ঔষুধ খেতে হবে। ডাক্তারের সঙ্গে রোগীর তর্ক চলে না।

তুমি বড় হতে চাও কি না। সেটা তোমার ইচ্ছা। তুমি যদি সারাজীবন হতাশা নিয়ে বেঁচে থাকতে চাও। জীবনে একবার দুবার ব্যর্থ হয়ে ভেঙে পড়ো, পরীক্ষায় একবার ফেল করে আত্মহত্যা করাই ভাল মনে করো। তাহলে আমার বলার কিছু নেই।

জীবন তো একটাই। এটা একটা কাদার তালের মত। এই কাদা দিয়ে তুমি যে কোন মূর্তি তৈরি করতে পারো। মা দুর্গাও তৈরি করতে পারো আবার অসুরও তৈরি করতে পারো। তোমার বাবা মা, বন্ধু বা আমি কেউই তোমার জীবনের কাদার তাল থেকে তোমার পছন্দসই কোন মূর্তি করে দিতে পারব না। আমরা তোমাকে উৎসাহ দিতে পারি, পরামর্শ দিতে পারি, কিন্তু তোমার জীবন তোমাকে তৈরি করে নিতে হবে।

তবে খুব ভোরবেলা যারা ঘুম থেকে ওঠে তাদের বেশি রাত জাগা উচিত

নয়। ছ ঘন্টা ঘুমনো যথেষ্ট।

অনেকের প্রবণতা আছে সন্ধ্যার পরই ঘুমিয়ে পড়ার। ইস্কুল থেকে বাড়ি এসে বই নিয়ে বসতে না বসতেই তাদের চোখ ঘুমে ঢুলে আসে।

বিদ্যাসাগর মশাই তাঁর ছেলেবেলায় তাঁর টিকির সঙ্গে দড়ি বেঁধে কড়িকাঠে দড়ির আর এক প্রান্ত বেঁধে দিতেন। যেই চোখ ঘুমে ঢুলে আসত অমনি টিকিতে টান পড়ত। অমনি তাঁর ঝিমুনি কেটে যেত। আমাদের ছেলেবেলায় অনেকে পরামর্শ দিত চোখে সরষের তেল মালিশ করতে। তাহলে ঝিমুনি কেটে যাবে। কিছুদিন আগে এক ভদ্রলোক তাঁর দু ছেলেকে আমার কাছে পরামর্শের জন্য নিয়ে এলেন। একটি ছেলে ক্লাস সেভেনে পড়ে। আর একটি ছেলে পড়ে ফাইভে। তারা দুজনেই পড়াশোনায় অমনোযোগী। তবে বড় ছেলেটির মহাদোষ, সে সন্ধ্যার পরই ঘুমে ঢলে পড়ে।

অনেক সময় দুরন্ত ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি বা খেলাধুলো করে এত ক্লান্ত হয়ে পড়ে যে তারা তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে। যারা ফুটবল খেলে বা সাঁতার কাটে তাদের তাড়াতাড়ি ঘুর এসে যায়। ওই ছেলেটি সাঁতারও কাটে না। ফুটবলও খেলে না। তবে এত ঘুম কেন?

অনেক সময় হরমোনের দোষ থাকলে, ডায়াবেটিস থাকলে ঝিমুনি আসে। আমার ডায়াবেটিস আছে তাই এক একটা সময় ঝিমুনিভাব আসে। এক নাগাড়ে বেশিক্ষণ পড়লে চোখ জ্বালা করে। যাঁরা হাটের রোগী তাঁদেরও

বিঝুমি আসে। হার্ট ও ডায়াবেটিস উভয় রোগীরই ঘুম পাতল হয়। রাতে যখন ঘুমের দরকার ঘুম আসতে চায় না।

কিন্তু একজন সুস্থ ছাত্রের কেন অত ঘুম আসবে? আমি ওর মাকে বললাম, ডাক্তার দেখিয়েছেন?

ওর মা বললেন, হ্যাঁ ডাক্তার দেখিয়েছি। তিনি টেস্ট করতে দিলেন। হরমোনের দোষ নেই। ডায়াবেটিস নেই।

তবে কেন এই ঘুম রোগ? আমি বললাম, মনঃস্তাত্ত্বিক কারণে এটা হতে পারে। যে সব ছেলেমেয়ে ফাঁকিবাজ, পড়তে চায় না। তাদের অবচেতন মনে পড়াশোনার প্রতি একটা অনাগ্রহ জন্মে যায়। পড়তে বসলেই মন বিদ্রোহ করে।

অথবা অনেক সময় উপযুক্ত ভিটামিন ও প্রোটিনের অভাবে স্নায়ুকোষগুলি দুর্বল হয়ে যেতে পারে। চোখের অসুখ থাকলে চশমা না নেওয়া পর্যন্ত এটি হতে পারে। কারণ চোখের ওপর চাপ সহ্য হয় না। চোখ জ্বালা কলে। চোখ বুজে আসে।

স্নায়ুগত দুর্বলতার জন্যও ঘুম আসতে পারে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এটা হয় অভ্যাসের দরুন। ওই যে বলছি মনের ভেতরকার ঘড়ির কথা। রোজ যদি সন্ধ্যার সাতটায় ঘুমনো অভ্যাস করো তাহলে রোজ সাতটা বাজতেই চোখ ঢুলে আসবে। আমার জানাশোনা এক ডাকসাইটে সরকারি অফিসার ছিলেন, রঘু ব্যানার্জি। তিনি অফিস থেকে ফিরে রোজ সন্ধ্যা সাতটায় তোফা ঘুমিয়ে নিতেন। রাত দশটায় উঠে খেয়ে দেয়ে আড্ডা দিতে বেরুতেন। সারারাত গাড়ি নিয়ে কলকাতার রাস্তায় টোটো করে ঘুরে শেষ রাতে বাড়ি ফিরে আবার তোফা ঘুম। তারপর নটায় উঠে তৈরি হয়ে অফিস যেতেন।

ছাত্র-ছাত্রীদের আমি কখনও রাত এগারটার বেশি জাগতে বলবো না। রাত দশটায় ঘুমতে যাওয়াও ভোর পাঁচটায় উঠে পড়া আইডিয়াল। এখন যদি রাত আটটা নটার সময় ঘুমের চোখ ঢুলে আসে তাহলে ইচ্ছাশক্তির জোরে সেই ঘুম দূর করতে হবে। এই ইচ্ছাশক্তি চালনা নিয়ে আমি পরের পরিচ্ছেদে আলোচনা করছি। এখন শুধু বলি অকাল ঘুম পেলে সে ঘুম কীভাবে কাটাতে হবে।

না, কোন ওষুধ খেয়ে নয়। ঘুম কাটাবার ও ঘুম তাড়াবার দুটো ওষুধই শরীরের পক্ষে খারাপ। খবরদার এসব ওষুধ খেও না। অনেকে ঘুম তাড়ানোর

জন্য ঘন ঘন চা-কফি খায়। এটাও খারাপ। চা চলতে পারে তবে পাতলা চা হবে। চিনি বা দুধ দেওয়া যাবে না। গরম গরম চা একটু করে খাওয়া চলতে পারে। তবে এক কাপের বেশি নয়। চা এর বিকল্প হিসাবে হরলিক্স, গরম দুধ বা বোর্নভিটা খেলেও একই কাজ হবে।

যখনই ঘুমে চোখ ঢুলে আসবে তখনই পড়া বন্ধ করে একটু পায়চারি করতে আসতে হবে। রাস্তায় একটু হেঁটে আসতে পারো অথবা ছাদে গিয়ে পায়চারি করতে পারো। জল কাদার দিন হলে ঘরের মধ্যেই পায়চারি করবে। যে বিষয় নিয়ে পড়ছিলেন সেই বিষয়টি পড়া সাময়িকভাবে স্থগিত রেখে অন্য একটা বিষয় ধরো। তাতেও যদি ঘুম আসে, দশ পনের মিনিট টিভি দেখে নাও, বাড়ির লোকের সঙ্গে একটু আড্ডা দিয়ে এসো। যাদের একবার পড়লেই মনে থাকে, বা ক্লাসের মাস্টারমশাই যা পড়ান সঙ্গে সঙ্গে মনে গেঁথে যায় তাদের বাড়িতে কম পড়লে চলে। অনেক সময় দেখা যায়, ভাল ছেলেরা বছরের বেশির ভাগ সময় পড়াশোনা করে না, আড্ডা দিয়ে কাটায় তারপর পরীক্ষার কিছুদিন আগে থেকে রাত জেগে পড়তে সে। এতেই তারা বাজিমাত করে ফেলে।

স্বামী বিবেকানন্দের অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল। তিনি একবার পড়েই একটা বই মুখস্থ করে ফেলতে পারতেন।

শরৎ চন্দ্র যখন এফ এ পরীক্ষা দেন, তার আগে কিছুই পড়েননি। পরীক্ষার আগের ক'দিন তিনি দরজা বন্ধ করে সারারাত ধরে পড়ে পরীক্ষা দিয়েছিলেন। সসম্মানে পরীক্ষায় পাস করেছিলেন তিনি।

আমাদের ক্লাসের ফার্স্টবয় জগদীশ শিকদারকে দেখতাম সারা বছর ঘুরে ঘুরে আড্ডা দিয়ে বেড়াচ্ছে কিন্তু পরীক্ষার কদিন আগে সারারাত পড়েই সে মাত করে দিত।

অধিকাংশ ছেলেমেয়ের তো তেমন মেধা থাকে না। তাঁদের মুখস্থ হতে দেরি হয়। বুঝতেও একটু দেরি লাগে। সবাই সব বিষয় বোঝে না। কেউ গণিতে ভাল। কেউ সাহিত্যে ভাল। ইতিহাস কারও কাছে দুচোখের বিষ। কারও কাছে খুবই আকর্ষণীয়। যারা পরীক্ষায় খুব ভাল রেজাল্ট করে তাদের সব বিষয়েই সমান ভাল হতে হয়। বিশেষ করে গণিতে খুব বেশি নম্বর না তুলতে পারলে খুব ভাল রেজাল্ট হয় না। কিন্তু তার জন্য মন খারাপ করে লাভ নেই। মেধা বা স্মৃতিশক্তি অভ্যাসের দ্বারা কিছু দূর পর্যন্ত পড়ানো যায়।

কিন্তু প্রত্যেকেরই একটা বুদ্ধি ও স্মৃতির একটা স্তর আছে। সব সময় জীবনকে স্কুল-কলেজের পরীক্ষা থেকে আলাদা করে দেখতে হবে। অনেক সময় সাধারণ বুদ্ধির ছেলেমেয়েরাও পরীক্ষায় ভাল নম্বর পেতে পারে। সুজনশীল প্রতিভা নেই, শুধু যন্ত্রের মত পড়াশোনা করে প্রতি বছর হাজার হাজার ছেলে ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করছে। বহু প্রতিভাবান পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করেনি। ধুত্তোর বলে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু তাই বলে পরীক্ষায় ভাল নম্বর তোমার কোন দাম নেই আমি বলছি না। আমাদের দেশে প্রতিভা ও বুদ্ধির যাচাই, পরীক্ষায় কে কত নম্বর পেয়েছে তার ওপর নির্ভর করে। সুতরাং ভাল চাকরি-বাকরি পেতে গেলে ভাল কেরিয়রের দরকার। ভাল কেরিয়র মানে সব পরীক্ষায় ৬০ শতাংশ নম্বর তোলা।

কিন্তু যদি কেউ তা না পারে তাহলে সে জন্য সে যেন হতাশ হয়ে না ভাবে আমার কিস্যু হলা না। বেঁচে থাকার মানেই হয় না।

চেষ্টা করেও যদি ভাল রেজাল্ট না করা যায় তাহলে তাকে এমন একটা কিছু পথ বেছে নিতে হবে যেখানে তার কাজ দেখানোর সুযোগ আছে।

আমি আমার হতাশ হবেন না বইতে বলেছি পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী সৃষ্টি হয়নি, যার কোন না কোন প্রয়োজন নেই। তেমনি এমন কোন মানুষ নেই যার কিছু না কিছু গুণ নেই। তাই মানুষ যদি ঠিকমত বুঝতে পারে কোন দিকে তার প্রবণতা আছে, কোন কাজটা সে পারে আর কোনটা সে পারে না তাহলে সে সেই কাজেই বেশি করে মন দেবে।

একজনের পক্ষে একা সর্ববিদ্যাবিশারদ হওয়া সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন তাঁর দ্বারা ইস্কুল কলেজে পড়া সম্ভাব হবে না। তাই তিনি বেশিদিন ইস্কুলে যাননি। তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে বিএ এম এ পাস করেননি। কিন্তু তিনি জানতেন তিনি লিখতে পারেন। তাই সেদিকেই বেশি করে নজর দিয়েছিলেন। সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ডাক্তার ছিলেন। কিন্তু তিনি বিধান রায়ের বড় ডাক্তার হতে পারেননি। কিন্তু তাঁর আর একটা গুণ ছিল—গল্প উপন্যাস কবিতা লেখা। তিনি সেদিকে চর্চা করেছেন ও বড় সাহিত্যিক হয়েছেন।

আমাদের গ্রামে প্রহ্লাদ ভট্টাচার্য বলে একটি ছেলে ছিল। প্রহ্লাদ আমার চেয়ে বছর তিন-চারের বড়। আমরা একই পাঠশালায় পড়তাম। প্রহ্লাদ পড়াশোনায় খুব ভাল ছাত্র ছিল না। ক্লাস সেভেন এইট পর্যন্ত পড়ে সে স্কুল

ড্রপ আউট হয়।

এর কয়েক বছর পরে দেখি প্রহ্লাদ ওই অঞ্চলের বড় রামায়ণ গায়ক হয়ে উঠেছে। যতদিন যেতে থাকে তত তার নাম ডাক হতে থাকে। অবশেষে কলকাতা থেকেও তার ডাক আসতে থাকে।

একদিন প্রহ্লাদ আমার কলকাতার বাড়িতে এল। আমি তার সঙ্গে কথা বলে অবাক হয়ে গেলাম। গোটা কৃত্তিবাসী রামায়ণ তার মুখস্থ। যে ছেলেটি ক্লাসের পড়া পারত না, সে গোটা রামায়ণ মুখস্থ করে রামায়ণ গান গেয়ে অর্থ ও সুনাম দুই-ই অর্জন করবে তা কে ভেবেছিল। এমনকী প্রহ্লাদও ভাবেনি। এটি তার আত্ম-আবিষ্কার।

প্রকৃতির এমন সুন্দর নিয়ম যে নদীর এক কূল ভাঙলে আর এক কূল গড়ে ওঠে। যে চোখে দেখতে পায় না, প্রকৃতি তাকে সুন্দর মিষ্টি কণ্ঠ দেয়। প্রখ্যাত কার্টুন শিল্পী চণ্ডী লাহিড়ীর এক হাত দুর্ঘটনায় কাটা পড়ে। কিন্তু একহাতে তিনি দারুণ দারুণ কার্টুন এঁকে চলেছেন। একজন হস্তহীন ব্যক্তি জগু পা দিয়ে তবলা বাজায়। আমি অনেক মেয়েকে দেখেছি দেখতে ভাল নয়। কিন্তু এত মিষ্টি গলা যে ঘোষিকা হিসাবে তারা চমৎকার কাজ করে। যার গায়ে খুব জোর নেই, ক্ষীণকায়, তার কিন্তু মস্তিষ্ক খুব ধারালো বুদ্ধি ধরে। ভাল ভাল কারুশিল্পীদের অধিকাংশই নিরক্ষর। এমনকী যে নিরক্ষর ছেলেটি কালিঝুলি মেখে মোটরগাড়ির অকেজো যন্ত্রপাতি নিমেষে সারিয়ে দিচ্ছে তাকে মূর্খ বলার আমার কী অধিকার আছে?

কলকাতার রাস্তার মোড়ে পানের দোকানদের দ্যাখো। আমি কী অমনভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা পা মুড়ে বসে পান তৈরি করতে পারব? এটা কি নৈপুণ্য নয়?

যার যেদিকে প্রবণতা তাকে সেদিকটাই আরও সমৃদ্ধ করে তুলতে উৎসাহিত করা উচিত। ন্যূনতম লেখাপড়া সবাইকে জানতে হবে। কিন্তু সবাইকে পণ্ডিত করে তোলার দরকার নেই। যেমন সবাই বোকা, বুদ্ধু বা আনপড় থাকবে এটাও কথা নয়। ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়ে কেউ যদি ভাবে আমার আর পুঁথিগত বিদ্যা নেবার দরকার নেই তার চেয়ে আমার যা গুণ সেটাকেই বিকশিত করে তুলি। তাহলে তাকে সেই বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া কর্তব্য। যদি মেশিনপত্রে আগ্রহ থাকে তাহলে মেকানিক হই। যদি ছবি টবি আঁকতে পারি তাহলে নকশা করার কাজ শিখি। হাতের কাজে যিনি দক্ষ,

তিনি নাই বা হলে বিএ এম এ অথবা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার। একজন প্লাম্বার বা ইলেকট্রিক মিস্ত্রি একজন কেরানির তিনগুণ রোজগার করে। এ দুনিয়ার সকলের জন্যই কাজ আছে। কত বিচিত্র পেশা আছে। আমাদের ভারতীয় সার্কাসগুলিতে প্রধানত কেরলের আলেপ্পী জেলার মানুষেরাই যোগ দেন। খুব ছোটবেলা থেকে তারা সার্কাস শিল্পী হবার স্বপ্ন দেখে। সেটাই মন দিয়ে শেখে। মোটামুটি কাজ চালাবার মত লেখাপড়া শেষে কিন্তু সার্কাসের ট্রাপিজের খেলা বা ব্যালেন্সের খেলাই তাদের জীবিকা। আর জীবিকা হিসাবে সেটি একজন কেরানির জীবিকা থেকে যে খারাপ নয় সেটাই বলতে পারি।

অনেক সময় কলকাতার ফুটপাতে দেখি কে যেন নানান গুঁড়ো রঙ দিয়ে মাকালী কিংবা মহাদেব এঁকেছে। হয়তো সে ভবঘুরে বা ভিখারির ছেলে। দুচার পয়সা পেলেই খুশী। কিন্তু একজন ভিখারি শিল্পী হবার মত গুণ কোথা থেকে পেল? অথবা কুমোরটুলিতে যে ছেলেটি সুন্দর মাটির প্রতিমা গড়ছে সে তো কোন স্কুলে পড়ে এই নৈপুণ্য শেখেনি। আজকাল অবশ্য কুমোরদের অনেক ছেলেমেয়ে আর্ট কলেজে যাচ্ছে, কিন্তু অধিকাংশই আর্ট কলেজে যায় না, বাড়িতেই শেখে। অথবা শিখতে হয় না ওটা তাদের মধ্যেই আছে।

ইওরোপ আমেরিকা যে এতদূর উঠেছে তার কারণ কিন্তু আব্রাহাম লিঙ্কন, জর্জ ওয়াশিংটন, উইনস্ট চার্চিল, হিটলার কিংবা লেনিন নন। এমনকি শেক্সপীয়র গ্যেটে কিংবা গোর্কিও নন। ইওরোপ আমেরিকা বড় হয়েছে তাদের অসাধারণ সব সাধারণ মানুষদের জন্য। এই সাধারণ মানুষেরা সকলে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। তারা কিন্তু সবাই লাখোপতি বা বিরাট প্রতিভাধর বুদ্ধিজীবী নন। তাদের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রমিক কৃষকরাও আছে। আছে নানা পেশার মানুষ। কিন্তু তারা সবাই জানে যার যেটুকু সামর্থ ও নৈপুণ্য আছে সেটুকু কাজে লাগাতে হবে। প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হবে। স্বাবলম্বী হতে হবে। কারণ সেই আঠারো বছর বয়স হয়ে যাবে অমনি বাবা-মা বলবে এবার নিজের পায়ে দাঁড়াও। আলাদা বাসা করে চলে যাও। নিজেকে নিজে দ্যাখো।

তারা জানে ওদের দেশের নিয়ম কেউ কাউকে ভরণপোষণ করবে না। বেকার ছেলে মেয়েকে মা-বাবাও খাওয়াবে না। তাই আমাদের নিজেদের যার যেটুকু যোগ্যতা আছে তার সদ্ব্যবহার করতে হবে। হাতের কাজ ও মাথার কাজে কোন ফারাক নেই। তুমি অফিসে বসে কলম পেষো। আমি ট্রাক্টর চালাই অথবা মেশিনে কাজ করি এর মধ্যে কোন তফাত নেই। মানুষ হিসাবে আমরা কেউ কারও চেয়ে কম নই।

যখনই তুমি এই আত্মবিশ্বাস নিয়ে আসতে পারবে তখনই দেখবে নিজেকে খুব হাল্কা মনে হচ্ছে। আর কোন দুঃখ থাকছে না। যারা ভাল ফুটবল খেলতে পারে, যারা ভাল ছবি আঁকতে পারে, যে সুন্দর হাতের কাজ শিখেছে তারা কোন অংশেই একজন শিক্ষকের থেকে ছোট নন।

শুধু মনে রাখতে হবে সব কাজেই বড় হওয়া যায়। যারা বাংলায় এম এ পাস করে আজকাল লোকে তাদের হেয় জ্ঞান করতে চায়। ডাক্তার ইঞ্জিনিয়র ছাড়া আর কেউ মানুষ নয়। কিন্তু আমি দেখবো, বাংলায় এম এ পাস করে কৃতী যারা তারা একজন বড় ডাক্তারের চেয়ে বেশি রোজগার করছে। অথবা অনেক বিখ্যাতও হয়েছেন। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বাংলার এম. এ. ছিলেন। আসল কথা হচ্ছে সব বিষয়েই যারা ওপরে উঠতে পারে তাদের সম্মান আছে। আর নিচে পড়ে থাকলে কোন জীবিকাতেই সম্মান নেই। কত লোক ডাক্তারি পাস করেও ভাল উপার্জন করতে পারছে না। জার্মান নেতা বিসমার্ক বলতেন, হয় আমি এক নং স্কাউন্ড্রেল হবো, না হয় এক নং নাগরিক হবো, সংস্কৃত কবি ভর্তৃহরি বলেছেন, মনস্বী ব্যক্তির কাছে দুটি পথ। হয়

লোকের মাথায় বোস না হয় লোক সমাজ থেকে অন্তর্ধান করো।

তাই যদি আলু বেচো তাহলে বাজারের সব চেয়ে বড় আলুওয়ালা হবে। দু নম্বরকে কেউ মনে রাখে না। সব সময় এক নম্বর হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। উৎকর্ষ বস্তুটি এমন যে সেটি শুধু অর্জন করলেই হয় না। সুনাম অর্জন করতে হয়। কলকাতায় মোড়ে মোড়ে মিষ্টির দোকান রয়েছে। সবাই সন্দেশ বেচছে। কিন্তু এক নং সন্দেশ কোনটা জিজ্ঞাসা করতেই লোকে বলবে অমুকের সন্দেশ। একে বলে সুনাম। তেমনি যে যেখানে থাকো 'গুড উইল' অর্জন করাটা বড় কথা। নৈপুণ্য এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে যে সব সময় লোকে এক ডাকে চিনতে পারে।❑

।। পাঁচ ।।

আবার তোরা মানুষ হ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এর প্রতাপ সিংহ নাটকে চারণীদের একটি গান আছে, 'গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ।' ছোটবেলায় প্রণাম করলে গুরুজনরা আশীর্বাদ করে বলতেন, মানুষ হও। আনন্দমঠে সন্তানরা দেশমাতার কাছে প্রার্থনা করছে, মা আমাকে মানুষ করো।

মানুষ হওয়া অর্থে বড় মানুষ হওয়া। আগেই বলেছি বড় মানুষ অর্থে বড় লোক বা ধনী হওয়া নয়। ধনী যদি হতে পারো তাহলে তো খুব ভাল। ধনী হলে মানুষের উপকার করা যায়। কিন্তু কাঙালের ধন চুরি করে বা দুর্নীতি করে রাতারাতি ধনী হওয়া নয়। পরিশ্রম করে বুদ্ধি খাটিয়ে ধনী হও—বিল গেটের মত কিংবা রকফেলারের মত। বিশ্বের বেশির ভাগ ধনীই অতি সাধারণ অবস্থা থেকে ধনী হয়েছেন। ওবেরয় হোটেলের মালিক ওবেরয় একজন স্টেনোগ্রাফার ছিলেন। বিখ্যাত বস্ত্রশিল্পের মালিক ধীরুভাই আম্বানি কেরানি ছিলেন। বিশ্বের অন্যতম ধনী রকফেলার ছিলেন হোটেল ওয়েটার। হেনরি ফোর্ড একজন মোটর মেকানিক। বিখ্যাত বাঙালি ধনী সাধন দত্ত একজন সাধারণ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। ব্যবসায়ীদের প্রায় সকলে সাধারণ অবস্থা থেকে ধনী হয়েছেন।

কিন্তু তুমি ধনী হলে সমাজের কী উপকার হল? সমাজ কেন তোমাকে মনে রাখবে? মনে রাখবে তুমি যদি মনের দিক থেকেও ধনী হও। সমাজের উপকারে যদি তোমার অর্থ খরচ করে দাও। তবেই লোকে তোমাকে মনে রাখবে।

যে সমাজ তোমাকে অনেক কিছু দিয়েছে সেই সমাজকেও তোমার কিছু দেওয়া উচিত। কত মানুষ সমাজের জন্য আত্মত্যাগ করেছেন, তুমি যদি আত্মত্যাগ নাও করো, অন্তত তোমার উপার্জনের উদ্বৃত্ত সমাজকে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। মুসলমান ধর্মে দান করা আবশ্যিক কর্তব্য। হিন্দু ধনীরাও একদা উদার হাতে দান করেছেন। ইস্কুল কলেজ দাতব্য চিকিৎসায়, জলাশয়

সব কিছু সামাজিক সম্পদ বদান্য মানুষের দানে গড়ে উঠেছে। বিদেশে কত বড় বড় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন জনগণের টাকায় চলছে। ইওরোপ-আমেরিকার বড় হবার গুণের কথা আগেই বলেছি। আর একটি গুণ বলছি, বদান্যতা। ওরা আয়ের নির্দিষ্ট অংশ চ্যারিটি করে। আমরা তাকেই বড় মাপের মানুষ বলব যিনি কিছু না কিছু অর্থ অকাতরে দান করেন। অনেকদিন আগে দুর্গাপুরে ভিরিঙ্গি হাইস্কুলে একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। ওই ইস্কুলের হেডমাস্টার মশাই রিটায়ার করার সময় তাঁর সারাজীবনের সঞ্চয় প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা ইস্কুলকে দান করেন। অথচ তিনি ধনী নন।

অনেক সময় আমরা গরিব মানুষের মধ্যে অনুকরণীয় মহত্ত্ব দেখি। কত ট্যাক্সিচালক ট্যাক্সির মধ্যে দামী গহনার বাক্স। টাকার ব্যাগ বা যাত্রীরা ফেলে গিয়েছিলেন, থানায় গিয়ে জমা দিয়ে এসেছেন।

ছোটবেলায় আমরা গরিব ছিলাম। সেই সময় আমাদের পাড়ায় এক বাড়িতে চুরি হয়। চোর বাক্স নিয়ে পালাবার সময় ঝোপের মধ্যে কটি গহনা পড়ে যায়। পরদিন সকালে মা গহনাগুলি কুড়িয়ে পান ও মালিককে ডেকে ফেরত দেন। এমন অনেক গরিব সৎ আছেন।

গরিব ও ধনী সকলের মধ্যেই খারাপ ও ভাল দুই লোক আছে। তবে ধনী হবার সুবিধা এই যে লোককে সাহায্য করা যায়। কিন্তু নিজের যদি টাকা নাও থাকে। অথচ অপরকে সাহায্য করার মত মন থাকে তাহলে সংগঠন তৈরি করে চাঁদা তুলে সাহায্য নিয়ে সমাজের উপকার করা যায়।

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি তো এইভাবেই চলে। কলকাতার বিখ্যাত সেবা প্রতিষ্ঠান আনন্দলোকের কথাই ধরা যাক না। এরা শস্তায় সাধারণ মানুষের চিকিৎসা করে। গরিবদের বিনামূল্যে রেশন দেয়। গ্রামে সমাজসেবার কাজ করে। সল্টলেকে এখন আনন্দলোকের দশতলা বিরাট হাসপাতাল হয়েছে।

ডি.কে. সরাফ নামে কলকাতা বাঙ্গুর অ্যাভিনিউবাসী এক মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক একরকম একা হাতে এই বিশাল সংগঠন গড়ে তুলেছেন। এসবই সম্ভব হয়েছে বদান্য ব্যক্তিদের লাখ লাখ টাকার দান নিয়ে। একদিনে কিন্তু এই বিশাল কাজ হয়নি। সরাফ সাহেব তো প্রথমে একটা গ্যারেজ ঘরে দাতব্য চিকিৎসালয় হিসাবে এই প্রতিষ্ঠানের সূচনা করেন। তাঁকে এখন কত লোক সাহায্য করছেন। কিন্তু বিরোধিতা যে পাননি তা নয়, কিন্তু বিরোধিতার মুখে তিনি বসে পড়েননি। লড়ে গেছেন।

সরাফের মত এমন অসংখ্য নিঃস্বার্থ মানুষ সমাজের উপকারের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। আবার পাশাপাশি তেমন লোকের সংখ্যা বেশি যাঁরা শুধু নিজেদের নিয়ে আছেন। সমাজের জন্য কিছু করার মত মন তাঁদের নেই। তাঁরা সব সময় নেতিবাচক কথা বলেন। সব কিছুতেই তাঁরা অপরের দোষ ধরেন। দোষ ধরা ভাল, তাতে উপকার হয়। কিন্তু সেইসঙ্গে নিজেও কিছু একটা করে দেখিয়ে দেওয়া দরকার। দোষ ধরা তারই সাজে যে নিজে একটা কিছু করে দেখাতে পারে।

যে নিজে কিছু না করে শুধু অন্যের নিন্দে করে বেড়ায় সে কখনও বড় হতে পারবে না। মহাভারতে আছে ধর্মরূপী বক যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করেছিল, আচ্ছা বল তো কে বেঁচে আছে?

যুধিষ্ঠির বলেছিলেন, কীর্তির্যস্য স জীবতি। যার কীর্তি আছে তিনিই বেঁচে আছেন। কীর্তি মানে কুকীর্তি নয়—সুকীর্তি, অর্থাৎ ভাল কাজ। দেশের ও দশের উপকারের জন্য কিছু করা। যদি খুব বেশি করতে না পারো তাহলে অন্তত মনের দিক থেকে উপকারি হও। যে তোমার কাছে আপদে বিপদে সাহায্যের জন্য আসবে তাকে উপকার করো, সাহায্য করো। কিন্তু তার জন্য কোন প্রতিদান চাইবে না। প্রতিদান এমনিতেই পাবে। ফুল যে গন্ধ বিতরণ করে সেকি কোন প্রতিদান চায়? সূর্য কী বলে আমায় পুজো করো তবে তোমায় রোদ্দুর দেব? কিন্তু সূর্যের পুজো তো হচ্ছে। অনেকে আবার সূর্যকে পাত্তা দিচ্ছে না। তাতে সূর্যের কিছু এসে যায়? যায় না। আমাদের দেশে রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, মহাত্মা গান্ধীর মত লোকেরও কত লোক বিরোধিতা করেছে। তাতে কি তাঁদের গৌরব কমেছে? বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী প্রমুখকে হত্যা করে কী তাঁদের আদর্শকে মুছে ফেলা গেছে? নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

দেশ ও দশের কাজে যারা আত্মদান করেছে তারা ইতিহাসে অমর হয়েছে। তবে শুধু আত্মদান করাটাই বড় কথা নয়। এখন তো প্রতিদিন কত লোক মারামারি কাটাকাটি করে মারা যাচ্ছে। উগ্রবাদীরা প্রতিদিন পুলিশের গুলিতে মারা যাচ্ছে আবার তারাও অসংখ্যা মানুষকে হত্যা করছে। তাই প্রাণ দেওয়াটা এখন কোন ব্যাপারটাই নয়। দেখতে হবে মহৎ কাজের জন্য জীবন উৎসর্গ হয়েছে কি না। দেশের স্বাধীনতার জন্য যারা প্রাণ দিয়েছেন তাদের আত্মদানের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতাবাদী বিপথগামী তরুণদের প্রাণ দেওয়ার কোন

তুলনা হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের প্রথমেই আছে প্রাণ দেওয়ার চেয়ে বড় দান হল ভক্তি। জীবন তো সবাই দিতে পারে। কিন্তু ভক্তি সকলে দিতে পারে না। ভক্তি মানে শুধু ঠাকুর দেবতা দেখলে ঢিপঢিপ করে প্রণাম করা নয়। ভক্তি হল মানুষকে গভীর ভালবাসা। মানুষকে ভালবাসার মধ্য দিয়েই ভগবানকে ভক্তি জানানো যায়। যারা মানুষকে ভালবেসে সমগ্রজীবন মানুষের সেবায় উৎসর্গ করেছে দেশ ও দশের প্রতি তাঁদের অবদান সমস্ত মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছে। স্বামী বিবেকানন্দ কিংবা মাদার টেরেসা আজ যে সারা বিশ্বে শ্রদ্ধা পাচ্ছেন তা ধর্মপ্রচারক হিসাবে নয়। তাঁরা মানুষের মঙ্গলের জন্য সারাজীবন উৎসর্গ করেছেন বলে।

তোমরা কাউন্ট লিও টলস্টয়ের নাম শুনেছ। টলস্টয়কে বেশির ভাগ লোকই সাহিত্যিক বলে জানে। কিন্তু টলস্টয় লেখক ছাড়াও বড়দরের একজন ধর্মসংস্কারক, সমাজ সংস্কারক সেই সঙ্গে একজন মহান মানবতাবাদী ছিলেন। টলস্টয় রাশিয়ায় এক বিরাট জমিদার ছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে খুব বিলাসী ছিলেন। হল্যান্ড থেকে তাঁর কাপড় কেচে আসত। তিনি যৌবনে বড় লোকদের নিষ্কর্মা ছেলেদের সঙ্গে মিশে বখে গিয়েছিলেন।

একদিন একটি গাছের তলায় বসে ধ্যান করতে করতে তাঁর মনে হল এই যে তাঁর প্রজারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করছে আর তিনি তাঁদের মেহনতের টাকায় বিলাসিতা করছেন। এইভাবে জমিদারি করাটা অন্যায়। তিনি তারপরেই তাঁর জমিদারির সমস্ত জমি প্রজাদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। আর তিনি চাষীদের সঙ্গে মাঠে গিয়ে তাদের সঙ্গে কাজ করতে লাগলেন। বই লিখে তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করেছেন। এই টাকাও তিনি গরিবদের বিলিয়ে দিলেন।

টলস্টয় এই আদর্শ প্রচার করলেন যে পরের জন্য জীবন দেওয়াই ধর্ম। পুরোহিতরা তাঁকে নাস্তিক ঘোষণা করে সমাজচ্যুত করার চেষ্টা করে কিন্তু তাঁর শতশত অনুগামী রুখে দাঁড়িয়ে বলে, টলস্টয় যদি নাস্তিক হন, আমরাও তাহলে নাস্তিক। টলস্টয় শেষজীবনে কপর্দশূন্য অবস্থায় বেরিয়ে পড়েছিলেন। ট্রেনে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃতদেহ নামানো হয় এক অখ্যাত স্টেশনে। মৃত্যুর সময় তাঁর কাছে ছিল তাঁর একটি ডাইরি আর একটি বাইবেল।

আমাদের দেশে বিদ্যাসাগর, চিত্তরঞ্জন প্রমুখ দান করেছেন। চিত্তরঞ্জন তাঁর বসতবাড়ি দান করেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার

মুখোপাধ্যায় তাঁর বসতবাড়ি দান করে যান। এমনি কত সাধারণ মানুষ রামকৃষ্ণ মিশনকে তাঁদের বসতবাটি দান করে দিয়ে গেছেন। পরের উপকারের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা ও ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গল।

নিবেদিতার আসল নাম ছিল মার্গারেট নোবেল। তাঁর পিতা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। গরিবদের জন্য তাঁর যথেষ্ট দান ধ্যান ছিল। কিন্তু মার্গারেট ছোটবেলায় তাঁর বাবাকে হারান। বাবার খুব ইচ্ছা ছিল মেয়ে সৎকাজে জীবন উৎসর্গ করুক।

সেই সুযোগ এসে গেল বহু বছর পরে। স্বামীজী তখন চিকাগো বক্তৃতা সেরে দেশে ফেরার পথে ইংলন্ডে এসেছেন। ইংলন্ডে তাঁর বক্তৃতা ছিল। মার্গারেট এক বন্ধুর অনুরোধে সেই বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হলেন। তিনি স্বামীজীর শিষ্য হয়ে ভারতে যাবার অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন।

ভারতে এসে নিবেদিতা সন্ন্যাসিনী হলেন। তিনি কলকাতায় একটি জীর্ণ বাড়ি ভাড়া করে বাস করতেন। ওখানেই তিনি মেয়েদের জন্য একটি ইস্কুল তৈরি করলেন। সে সময় কলকাতায় প্লেগ দেখা দিল। নিবেদিতা প্লেগপীড়িত লোকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেবা শুশ্রূষা করতে লাগলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভারতের হিতের জন্য দান করে যান।

ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গল ছিলেন জমিদারের মেয়ে। ছোটবেলা থেকেই বিলাস, বৈভবের মধ্য দিয়ে মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। ছোটবেলা থেকে

পশুপক্ষীর প্রতি তাঁর গভীর মমতাবোধ ছিল। একদিন তিনি দেখলেন তাঁর পরিচিত এক কৃষক মাঠে কাজ করছে কিন্তু তার পোষা কুকুরটি যে সব সময় তার সঙ্গে থাকে, সে নেই। নাইটেঙ্গল জিজ্ঞাসা করলেন। তোমার কুকুর কোথায়? কৃষক বলল, আর বলবেন না দিদিমণি। একটা বদমাশ ছেলে ইট মেরে তার একটা পা খোঁড়া করে দিয়েছে। সে আর হাঁটতে পারছে না। পায়ের যন্ত্রণায় ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে। তার যন্ত্রণা আর দেখতে পারছি না। তাই তাকে আজ মেরে ফেলে ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেব ভাবছি।

নাইটেঙ্গলের মন খুব খারাপ হয়ে গেল। তিনি কুকুরটিকে দেখতে গেলেন। দেখলেন তার একটি পা ক্ষতবিক্ষত। নাইটেঙ্গল সঙ্গে সঙ্গে একটি ফ্লানেলের জামা দিয়ে কুকুরের পায়ে সেঁক দিতে লাগলেন। অনেকক্ষণ সেঁক দেবার পর কুকুরটির যন্ত্রণা কমল। কয়েকদিন সেবা করার পর কুকুরটির পায়ের বেদনা সেরে গেল। এই ঘটনার পর নাইটেঙ্গলের কেন যেন মনে হল তিনি যদি নার্সের কাজ নেন, তাহলে কত লোকের সেবা করতে পারবেন। এই সময় এক সৈনিক হাসপাতাল দেখতে গিয়ে তাঁর মনে হল যুদ্ধে কত লোক আহত হয়, তিনি যদি তাদের সেবা করতে পারেন তাহলে কত উপকার হয়। এরপর তিনি নার্সিং কলেজে ভর্তি হয়ে ট্রেনিং নিয়ে বিভিন্ন হাসপাতাল ঘুরে ঘুরে হাসপাতালগুলির উন্নতি করতে লাগলেন। প্রচণ্ড পরিশ্রমে তাঁর শরীর ভেঙে গেল। ডাক্তাররা তাঁকে বিশ্রাম নিতে বললেন। তিনি যখন বিশ্রাম নিচ্ছেন সেই সময় শুরু হল ক্রিমিয়ার যুদ্ধ। খবরের কাগজে প্রকাশিত হতে লাগল যুদ্ধের হাতহতদের খবর। আহত সৈনিকদের দুরবস্থার কথা। নাইটেঙ্গেল আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি অসুস্থ অবস্থাতে ছুটে গেলেন যুদ্ধের মধ্যে আহতদের সেবা করার জন্য।

যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে দেখলেন আহত সৈনিকেরা পড়ে আছে। চিৎকার করছে যন্ত্রণায়। রোগী পিপাসার সামান্য জল পর্যন্ত পাচ্ছে না। ওষুধ ও পথ্য তো দূরের কথা। নাইটেঙ্গল এই দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়ে পড়লেন। শুরু হয়ে গেল তাঁর সেবার কাজ। দিনে কুড়ি ঘন্টা করে তিনি পরিশ্রম করতেন। অল্পদিনের মধ্যে সৈনিকদের মধ্যে আশার ভাব ফিরে এল। একটি লণ্ঠন নিয়ে তিনি শিবির থেকে শিবির ঘুরে বেড়াতেন বলে তাঁর নাম হয়ে গেল 'দীপ হাতে রমণী'—এ লেডি উইথ এ ল্যাম্প।

এই খবর ইংলন্ডে পৌঁছলে সেখানকার জনগণ ধন্যধন্য করল। তাঁর সেবার কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইংলন্ডের বহু নারী নার্সের কাজে নাম লেখালেন। তিনি দেশে ফিরলে ইংলন্ডের জনগণ তাঁকে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড দিয়ে সম্বর্ধনা দিল। ওই টাকা তিনি নার্স ট্রেনিং এর জন্য দান করলেন। ইংলন্ডের রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড তাঁকে Order of Merit উপাধিতে ভূষিত করেন।

কিন্তু তিনি চাইতেন না তাঁকে নিয়ে কোন হইহই হোক। তিনি বলে গিয়েছিলেন কোন আড়ম্বর না করে দীনভাবে তাঁর গ্রামের সমাধিক্ষেত্রে তাঁকে যেন সমাধিস্থ করা হয়।

তাঁর সমাধির ওপর সম্রাজ্ঞী আলেকজান্দ্রা একটি ফুলের তোড়া পাঠিয়েছিলেন। তাতে লেখছিল, 'মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ হিতকারিণী।'

ভগিনী নিবেদিতা ও নাইটেঙ্গেলের জীবন এটাই প্রমাণ করে মানুষ তার নিজের আত্মত্যাগের মাধ্যমে, সেবার দ্বারায় মহত্ত্ব অর্জন করতে পারে। প্রত্যেক গ্রাম কিংবা শহরে এমন একাধিক মানুষ আছেন যাঁরা শুধু ত্যাগের দ্বারা নিজেদের গৌরবান্বিত করেছেন। এর জন্য তাঁদের মেধাবী ছাত্রছাত্রী হতে হয়নি। প্রথম শ্রেণীর প্রথম হতে হয়নি। জন্মদত্ত কোন প্রতিভার অধিকারিণী হতে হয়নি। তাঁরা তাঁদের কঠোর সেবাব্রতের মধ্য দিয়ে, গভীর মানব-হিতৈষণার মধ্য দিয়ে নিজেদের বড় করে চিহ্নিত করেছেন।❑

।। ছয় ।।

কমন করে বড় হবো?

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কাজ হয় না। কৃত্রিম উপায়ে কখনও এমন জিনিস তৈরি করা যায় না যাতে খাঁটি জিনিসটির সব গুণই থাকবে। খবরের কাগজে প্রচার করে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে একজনকে হঠাৎ বড় বলে প্রচার করা যায়। কিন্তু ভেতরে বড় হওয়ার গুণ না থাকলে ওই নাম বেশি দিন থাকে না। বড় হওয়া মানে যে খুব হতে হবে বিখ্যাত তার কোন মানে নেই। তুমি যদি পাঁচজন থেকে একটু আলাদা হও, একটা কিছু নতুন সৃষ্টি করে যাও তা সে একটা ভাল বই হোক, ভাল ছবি হোক বা বিজ্ঞানের কোন আবিষ্কার হোক তুমিই তার জন্য অসীম আনন্দ পাবে। এই আনন্দই তোমার পুরস্কার।

তুমি যদি সৎ হও তাহলে তুমি তোমার নিজের জন্যই সৎ হবে। খবরের কাগজে তোমাকে সৎ বলে সার্টিফিকেট দেবে সেজন্য নয়। উদারতা, সততা ও খাঁটি মানুষ হওয়ার মধ্যে অনাবিল আনন্দ লুকিয়ে আছে। তুমি যদি সফল হও প্রত্যেকটি সাফল্যের মধ্যেই আনন্দ পাবে। সবাই যে ইংলিশ চ্যানেল পার হবে তার কোন মানে নেই। কিন্তু সাঁতার কেটে যখনই তুমি পাড়ার পুকুরটা এপার-ওপার করতে পারবে তখনই তুমি নিজেকেই নিজে পুরস্কার দিলে। অথবা সাইকেলে করে যদি দশমাইল পথ যেতে পারো তোমার আত্মবিশ্বাস বাড়বে। এর জন্য ভূপর্যটক হবার দরকার নেই। যদি সৌরভ গাঙ্গুলির মত ক্রিকেট নাও খেলতে পারো, তবু যদি স্কুলের ক্রিকেট টিমে খেলে জেলার মধ্যে চাম্পিয়ন হতে পারো সেটা কিন্তু কম নয়। যে কোন নৈপুণ্য তা যত ছোটই হোক না কেন, তা মানুষকে গভীর আত্মবিশ্বাস দেয়। সে আত্মবিশ্বাস হল—'আমি পারি।' তুমি কি পার না তার হিসাব করে মনে দুঃখ পেয়ে লাভ নেই। সবাই সব পারে না। কিছু কিছু কাজ পারে।

কোন কাজটা তুমি পারো তার একটা তালিকা তৈরি করো। অথবা তোমার তালিকা যদি না থাকে আমি নিচে একটা তালিকা দিচ্ছি তুমি শুধু টিক

দিয়ে যাও।

১. আমি ভাল ফুটবল খেলতে পারি।
২. আমি ভাল ক্রিকেট খেলতে পারি।
৩. আমি ভাল টেবল টেনিস খেলি।
৪. আমি ভাল ক্যারম খেলি।
৫. আমি ভাল ব্রিজ খেলা জানি।
৬. আমি ভাল আবৃত্তি করতে পারি।
৭. আমি ভাল অভিনয় করতে পারি।
৮. আমি ভাল গান গাইতে পারি।
৯. আমি ভাল অঙ্ক কষতে পারি।
১০. আমি ভাল ডিবেট করতে পারি বা বক্তৃতা দিতে পারি।
১১. আমি ক্যুইজ করতে পারি।
১২. আমি কবিতা-গল্প লিখতে পারি।
১৩. আমি ভাল গল্প বলতে পারি।
১৪. আমি ভাল ছবি আঁকতে পারি, মূর্তি গড়তে পারি।
১৫. আমি ভাল সেলাই জানি।
১৬. আমার হাতের লেখা ভাল।
১৭. আমার অনেক কবিতা মুখস্থ আছে।
১৮. আমি ছোটখাটো মেরামতি করতে পারি।
১৯. আমি বাগান করতে পারি।
২০. আমি চাষের কাজ জানি। নিজে লাঙল চালাতে পারি।

ওপরে ২১টি নৈপুণ্যের মধ্যে তুমি কতগুলি নৈপুণ্য জানো। প্রতিটি নৈপুণ্যের জন্য পাঁচ নম্বর করে পেলে ১০০-র মধ্যে কত পাবে?

যদি খুব কম পাও, বিব্রত হবার কিছু নেই। অনুশীলনের দ্বারা সব কটি নৈপুণ্য রপ্ত করা যায়।❑

।। সাত ।।

চরিত্রের সন্ধানে

নৈপুণ্য অর্জন করা সোজা কিন্তু চরিত্র গঠন করতে গেলে যেভাবে অভ্যাসের রদবদল ঘটাতে হয় তা বেশ কঠিন।

চরিত্রের কিছু কিছু মাতৃগর্ভ থেকে তৈরি হয়ে যায়। কিছুটা তৈরি হয় শৈশবের পরিবেশ থেকে। ছোটবেলায় তোমার স্কুলের পরিবেশ, তোমার সঙ্গীসাথী সবাই তোমার চরিত্র গঠনে সাহায্য করে।

বড় হতে গেলে চরিত্রের কতগুলি গুণ তো খুবই দরকার। যেমন ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, লেগে থাকার ক্ষমতা। বাধা-বিপত্তিতে পিছিয়ে গেলে চলবে না। বরং বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়েই যে এগিয়ে যাবে তারই কৃতিত্ব বেশি। পরিশ্রমী হওয়া, নিয়মানুবর্তী হওয়া আর স্বাবলম্বী হওয়া এই তিনটি গুণ যার চরিত্রে আছে তাকে কেউ দমিয়ে রাখতে পারবে না। সে বড় হবেই।

কঠোর পরিশ্রমের কোন বিকল্প নেই। আজকাল অনেক যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হওয়ায় মানুষের কায়িক শ্রম কমে গেছে। কিন্তু কায়িক শ্রম না করে শুধু মাথার কাজ করলে বড় হয়ে শরীরে নানা রোগ দেখা দেবে। স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা করতে হয় খুব বেশি। সেইজন্য তাদের বেশি করে কায়িকশ্রম করতে হয়। শহরের ছেলেমেয়েরা স্কুল বাসে করে বা ভাড়া গাড়ি করে ইস্কুলে যায়। ক্লাস সেভেনে উঠে ইস্কুল থেকে ফেরাটা যদি হেঁটে ফেরো তাহলে বেশ কিছুটা পরিশ্রম হবে। আত্মবিশ্বাসও বাড়বে। আমি ক্লাস থ্রি থেকে রোজ তিন মাইল পথ হেঁটে যাওয়া-আসা করতাম। আমার অনেক সহপাঠী আরও দূর-দূর থেকে হেঁটে আসত।

অনেক মা স্কুলের ছেলেদের খাইয়ে দেন। জুতোর ফিতে বেঁধে দেন। এটা খুব খারাপ অভ্যাস। খুব ছোটবেলা থেকে নিজে ভাত মেখে খাওয়া অভ্যাস করতে হবে। নিজের জুতোর ফিতে নিজে বাঁধবে। বাবা-মা ইস্কুলে পৌঁছে দিলেও স্কুল ব্যাগ নিজের কাঁদে কাঁদে নেবে। বাবা-মাকে দিয়ে বওয়াবে না। অনেক সময় দেখি ছেলেমেয়েকে ইস্কুল থেকে নিয়ে বাবা-মা

ট্রামবাসে ফিরছেন। কিন্তু ছেলেমেয়ে জাগয়া পেয়েছে। বাবা-মা ভিড়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন।

ছোটদেরই শেখা উচিত যে বাবা-মা বয়সে বড়। তাঁদের দাঁড় করিয়ে রেখে ছেলেমেয়ের বসে যাওয়াটা খারাপ। ছোটরা এমন পরিস্থিতিতে বলবে যে আমি দাঁড়াচ্ছি তুমি বোস।

ছেলেমেয়েদের কষ্টসহিষ্ণু করে না তুললে তারা বড় হয়ে কোনদিনই মানুষ হতে পারবে না। প্রাচীন গ্রিসে একটি ছোট্ট রাজ্য ছিল স্পার্টা। স্পার্টা ছোট রাজ্য হলেও কিন্তু বীরত্বে তারা আর সব রাজ্যকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কীভাবে এটা সম্ভব হয়েছিল? কোন ছেলে জন্মালে তাকে মা বাবার কাছে থেকে বিচ্ছিন্ন করে শৈশব থেকেই তাকে সৈনিক হবার জন্য প্রস্তুত করা হত। অনাড়ম্বর এবং কঠোর জীবন যাত্রা ছিল তাদের। সব রকম পরিশ্রম সহ্য করতে হত তাদের। তাদের খাওয়া দাওয়াও ছিল অতি সাধারণ।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি দেখেছি কিশোর ও যুবক বাংলাদেশিরা মুক্তি যোদ্ধা হিসাবে প্রচণ্ড কষ্ট করেছে। নদীয়ার শিকারপুরে তাদের একটি শিবিরে গিয়ে দেখেছিলাম বালিশের অভাবে তারা ইঁট পেতে শুয়ে আছে। ওই দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছিল বলেই তারা বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে পেরেছিল।

দৃঢ় চরিত্রের মানুষ হবে কুসুমের মত কোমল, বজ্রের মত কঠোর। যা তিনি সত্য বলে বুঝবেন তার জন্য তিনি জীবন দেবেন। স্বামীজী বলতেন সত্যের জন্য সব কিছু ত্যাগ করা যায়। কিন্তু সব কিছুর বিনিময়েও সত্যকে ত্যাগ করা যায় না। দৃঢ়চেতা মানুষের সামান্য দুঃখে তাঁর চোখ ফেটে জল আসবে। তিনি কোন অবস্থাতেই মানবতা বিরোধী কোন কাজ করবেন না। এরই নাম মহত্ত্ব। কত সাধারণ মানুষ এই মহত্ত্ব দেখিয়ে অমর হয়ে রয়েছেন। স্যর ফিলিপ সিডনির গল্প অনেকে পড়েছ। যুদ্ধক্ষেত্রে আহত ফিলিপ সিডনি পিপাসার্ত হয়ে যখন তাঁর বোতলের জল পান করতে যাচ্ছেন সেসময় দেখলেন এক আহত সৈনিক তাঁর দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে আছে। সিডনি বললেন, তোমার প্রয়োজন আমার চেয়ে বেশি। এই বলে বোতলের সমস্ত জল তাঁকে দিয়ে দিলেন। জলের অভাবে সেনাপতি ফিলিপের মৃত্যু হল।

সুইডেন ও ডেনমার্কের মধ্যে যুদ্ধে এই ধরনের আর একটি ঘটনা ঘটে। একজন ডেন সৈনিকের কাছে ছিল এক বোতল জল। সে জল খেতে যাবে। এমন সময় দেখল এক আহত সুইডিস সৈন্য জল জল বলে কাতরাচ্ছে। ডেন সৈনিক অমনি তার শত্রুপক্ষের সৈন্যটিকে জলের পাত্রটি এগিয়ে দিল। সুইস সৈনিকটি জল খেয়ে একটু চাঙ্গা হয়ে অমনি ডেনিস সৈন্যটিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ল। গুলিতে আহত হয়ে ডেনিশ সৈনিক বলেছিল, তুই আমায় গুলি করলি? ভেবেছিলাম জলের পুরোটা তোকে দেব। এখন আর তোকে পুরোটা দেব না। অর্ধেক আমি খাবো। অর্ধেক তোকে দেব। বলে জলের পাত্রটি তার হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিল সৈনিকটি।

মহৎ মানুষ কোন অবস্থাতেই বদলায় না। শত্রুকেও সে ক্ষমা করে। সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করে।

চরিত্রবান মানুষ হবে বিনয়ী মানুষ। বিনয় অর্থে নম্রতা। হামবড়া বা অহংকারিকে কেউ পছন্দ করে না। খুব আত্মবিশ্বাসী না হলে বিনয়ী হওয়া যায় না। আত্মবিশ্বাসের অভাব থেকেও আবার এক রকমের বিনয় আসে। সেটি দাস্যতা। এই ধরনের লোকেরা অকারণে ক্ষমতাবান লোকদের খোশামোদ করে। আমি যখন একটি কাগজের সম্পাদক ছিলাম তখন কত লোক আমাকে খোশামোদ করত। আর সেকী বিনয় তাদের। যেই আমি আর সম্পাদক রইলাম না, অমনি তারা নিজমূর্তি ধরল। এখন আর তারা আমায়

দেখলে চিনতে পারে না। অনেকে আমায় গালমন্দ না করে জল খায় না।

এরা হল সুবিধাবাদী স্বার্থপর ছদ্মবিনয়ী। এদের আত্মবিশ্বাস নেই। আসলে এরা প্রকৃত শিক্ষা পায়নি।

প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি সর্বদাই বিনয়ী থাকেন। তাঁদের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে অহংকার ফুটে ওঠে না। তাঁরা জানেন, তাঁরা কী। মুখে বড় বড় কথা বলে তো লাভ নেই। প্রকৃত বিদ্বান জানেন, বিদ্যার শেষ নেই। তাই বিদ্যার অহংকার করে লাভ নেই। বরং বিনয়ই বিদ্যাকে আরও ঝলমলে করে তোলে। কয়েকজন প্রকৃত জ্ঞানীর বিনয়ের উদাহরণ দেই।

একবার ঠাকুর রামকৃষ্ণ এসেছেন বিদ্যাসাগরের কাছে।

বিদ্যাসাগরকে দেখে রামকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে হাত জোড় করে নমস্কার করলেন। প্রত্যুত্তরে বিদ্যাসাগরও ঠাকুরকে নমস্কার করলেন। আবার দেখা গেল ঠাকুর নমস্কার করছেন বিদ্যাসাগরকে।

এইভাবে দুজনের মধ্যে চলছে নমস্কারের প্রতিযোগিতা।

বাইরের লোক দেখে ভাববে বুঝি দুজনই পাগল হয়ে গেছেন। কিন্তু না, সৌজন্যের প্রতিযোগিতায় কেউ কারও কাছে হারতে রাজি নন।

যাঁরা বড় হন, তাঁরা শুধু জ্ঞানে বড় হন না গুণেও বড় হন। তাঁদেরও মধ্যে বেশি করে থাকে সমস্ত মানবিক গুণ। দয়া সৌজন্য চরিত্রবল। এই

মানবিক গুণগুলি শুধু মহাপুরুষদের মধ্যেই যে থাকবে তা নয়, প্রতিটি মানুষের মধ্যেই থাকা উচিত।

রামকৃষ্ণদেব ইস্কুলে পড়েননি, কিন্তু অসাধারণ জ্ঞানী। বেদ পুরাণ উপনিষদ বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র তিনি সবই অধিগত করে ফেলেছেন। আর বিদ্যাসাগর তো জ্ঞানের সাগর। তাঁর মত অত বড় পণ্ডিত বাংলাদেশে আর কটি খুঁজে পাওয়া যাবে।

কিন্তু প্রকৃত বিদ্বান ব্যক্তিরা সবসময়ই বিনয়ী হন। কখনও নিজের জ্ঞান নিয়ে অহংকার করেন না।

বিদ্যাসাগর আর রামকৃষ্ণের মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছিল তাতেই বুঝতে পারবে দুজনেরই বিনয়ের পরিমাণ কতখানি।

রামকৃষ্ণদেবের শিষ্য মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃততে দুজনের কথাবার্তা তুলে ধরেছেন।

কথাবার্তার মধ্য দিয়ে সৌজন্য ও বিনয়ের পরীক্ষায় কেউ কম যান না।

রামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা হতেই বললেন, আজ সাগরে এসে মিললাম। এতদিন খাল বিল নদী দেখেছি, এবার দেখছি সাগর। শুনে বিদ্যাসাগর বললেন, তবে লোনা জলই খানিকটা নিয়ে যান।

রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে সঙ্গে বললেন, না গো, লোনা জল কেন? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও। তুমি যে বিদ্যার সাগর। তুমি ক্ষীর সমুদ্র।

বড় বড় মানুষদের এই বিনয় ও সারল্যের আরও কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের নাম তোমরা সবাই জানো। আইনস্টাইন একবার গেছেন প্যারিসের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক উপাধি নেবার জন্য। উঠেছেন একটি হোটেলে। তখন তাঁর নাম জগৎজোড়া। কিন্তু হোটেলে কাউকে একথা বলেননি যে তিনি বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন।

পরদিন এক ভদ্রলোক এসেছেন হোটেলে। হোটেলের ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করছেন আচ্ছা বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন কোন ঘরে উঠেছেন বলতে পারেন? ম্যানেজার বললেন, বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন? না মশাই। তিনি এখানে কোথা থেকে আসবেন?

তবে আইনস্টাইন নাম একটা লোক কাল এসে উঠেছে। মনে হচ্ছে বোধ হয় লোকটা কোন সেলসম্যান-ট্যান হবে। ভদ্রলোক খাতা দেখে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ ইনিই তো সেই বিখ্যাত আইনস্টাইন। ম্যানেজারের তবু

বিশ্বাস হয় না। তাই কখনও হতে পারে? আইনস্টাইন কী কিছু না বলে এভাবে সাধারণ মানুষের মত ঘুরে বেড়াতে পারে?

কিন্তু আইনস্টাইনকে ডেকে ম্যানেজার যখন জিজ্ঞাসা করলেন, তখন আইনস্টাইন মিটিমিটি হেসে জবাব দিলেন, আমি সেই বিজ্ঞানী। ম্যানেজার তখন হতবাক।

বিনয়ী হওয়া তোমার নিজের ভালর জন্যই দরকার। কারণ তুমি যত বিনয়ী হবে লোকে তোমায় তত ভালবাসবে। আমি এখন শিক্ষকতা করি। আমরা শিক্ষকরা সেই ছাত্রছাত্রীকে বেশি ভালবাসি যে নাকি বিনয়ী। যে কিছু না কিছু শিখতে চায়। যে আত্মসমর্পণ করে, অথচ আত্মমর্যাদা বিসর্জন দেয় না।

বিনয়ী আর বেশি বয়সে হওয়া যায় না। কারণ এটা একটা অভ্যাস। এটি এক ধরনের মূল্যবোধ। বড় হলে আর মূল্যবোধ স্বভাবের সঙ্গে মিশে যায় না। তখন হয় সেটি কৌশল। অনেকে কৌশল হিসাবে বিনয়কে নেয় এবং যেখানে দরকার সেখানে প্রয়োগ করে। কিন্তু আমরা চাই বিনয় তোমার স্বভাবের অঙ্গ হয়ে থাকুক। যতদিন বাঁচবে বিনয়ী হয়ে বাঁচবে।

বিনয়ী হতে গেলে যেটি সর্বপ্রথম অভ্যাস রপ্ত করতে হবে—

১. বাবা মায়ের মুখের ওপর তাদের প্রতি অপমানসূচক কথা বলবে না।

২. শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলার সময় সমীহ করে কথা বলবে। কোন শিক্ষক ভাল পড়াতে না পারলে বলবে না, আপনি কিছু পড়াতে পারেন না। বলবে স্যার আপনার পড়ার এই জায়গাটা ঠিক বুঝতে পারছি না।

৩. কখনও প্রকাশ্যে নিজের গুণ ও বিদ্যা জাহির করবে না। আমার বাবা বিরাট অফিসার, আমার দাদু আমার মামা বিখ্যাত ব্যক্তি এই সব কথা বলবে না। কখনও বড়লোক আত্মীয়দের নিয়ে গর্ব করবে না। এটি এক ধরনের দেউলিয়াপনা। যখন অন্য কারও ঘরে ঢুকবে 'মে আই কাম ইন স্যর' বলে ঢুকবে। বসতে না বললে বসবে না। দাঁড়াবে সোজা হয়ে। টেবিলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াবে না। শিক্ষকদের সঙ্গে প্রথম দেখা হলে গুড মর্নিং স্যর বলবে। পরিচিতদের সঙ্গে প্রথম দেখা হলে কথা বলার সময় না থাকলে একটু হাসবে। সৌজন্য ও বিনয় একই টাকার এপিট-ওপিট। সৌজন্য শুধু ওপরে ওপরে ভাল সম্পর্ক রাখা নয়। সৌজন্য প্রকাশ পায় নিচের আচরণবিধিগুলি পালন করলে—

* ট্রামে বাসে যদি দেখো তোমার চেনা বয়স্ক লোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তুমি তাকে জায়গা ছেড়ে দেবে।

* তোমার কোন ছাত্রীবন্ধুর সঙ্গে একসঙ্গে কোথাও যাচ্ছ। ট্রাম বাস ট্যাক্সিতে ওঠার সময় তাকে আগে উঠতে দেবে। নামার সময়ও তাকে আগে নামিয়ে তবে নামবে।

* পড়ার সময় কোন বন্ধুর বাড়ি গিয়ে তাকে খেলতে ডাকবে না।

* কোন জিনিস কখনও কাড়াকাড়ি করে নেবে না।

* খেতে বসে শব্দ করে খাবে না। কখনও খাই খাই করবে না। বন্ধুর বাড়ি বন্ধুর মা অসময়ে খেতে বললে বলবে মাসীমা, এখন আমি খাবো না। আমি এইমাত্র বাড়ি থেকে খেয়ে আসছি। কখনও পেটুক বলে বদনাম কিনবে না। নিমন্ত্রণ বাড়িতে গিয়ে যতটুকু হজম করতে পারবে ততটুকুই খাবে। সব কিছু খাওয়ার অভ্যাস করবে। এটা খাবো ওটা খাবো না করবে না। বিশেষ করে অন্যের বাড়ি। এতে তাঁরা বিব্রত হবেন। পাতে কিছু ফেলে রাখবে না।

* নিয়মানুবর্তী হবে। ক্লাস আরম্ভ হবার পডর ঢুকবে না। কারও কাছে যখন যাবে বলতে ঠিক তখনই যাবে। ঘড়ি ধরে চললে দেখবে ঘড়ি তোমাকে জীবনে দাঁড়াতে সাহায্য করছে।

* সত্যি কথা বলতে ভয় পাবে না। তার জন্য যদি ক্ষতি স্বীকার করতে

হয় সেও ভাল। একবার মিথ্যার আশ্রয় নিলে তার জালে এমন করে আটকে যেতে হয় যে সহজে তা থেকে মুক্তি মেলে না।

মনের রাখবে যারা মূর্খ তারাই অহংকার করে। অনেক বিদ্বান বিদ্যার অহংকার করে। কিন্তু বিদ্যার শেষ নেই। জ্ঞানের শেষ নেই। সেদিন থেকে প্রতিটি মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। নিউটনের মত অত বড় জ্ঞানী বলতেন, আমি জ্ঞান-সমুদ্রের তীরে নুড়ি কুড়িয়ে বেড়াচ্ছি। আমি সব সময় স্বীকার করি যে আমি কিছুই জানি না। সারাজীবন লেখাপড়া করে তিল তিল করে জ্ঞান আহরণ করে শেষ বয়সে এসে বুঝতে পারছি হাজার ভাগের এক ভাগও শিখতে পারিনি। আমরা সচরাচর যাদের পণ্ডিত বা জ্ঞানী বলে মনে করি তাদের বই পড়ে মুখস্থ করার ক্ষমতা এবং সেটা ধরে রেখে দেওয়ার ক্ষমতা সাধারণের থেকে বেশি। তাঁরা সব সময় মৌলিক কথা কিছু বলেন না। আবার যদি কেউ বিজ্ঞানের কোন সূত্র আবিষ্কার করেন, দেখা যায় তাও পরবর্তীকালে নতুন সূত্র বার হওয়ায় সে সূত্র অচল হয়ে গেছে। জ্ঞান অনন্ত এবং পরিবর্তনশীল। তাই কোন প্রকৃত জ্ঞানী জ্ঞানের অহংকার করেন না।

অর্থ ও প্রতিপত্তির গর্ব করাও উচিত নয়। বহু ধনী গরিব হয়ে যান। আমি এক ভদ্রলোককে জানতাম। তিনি সাধারণ অবস্থা থেকে ধনী হয়েছিলেন। কিন্তু অহংকারে তিনি ধরাকে সরা জ্ঞান করতেন। একদিন তাঁর ব্যবসা উঠে গেল। বালিগঞ্জের বাড়ি বিক্রি করে গেল। তিনি শহরের উপকণ্ঠে শেষ জীবনে এক ভাড়া বাড়িতে দরিদ্রের জীবনযাপন করতেন।

ইতিহাসে আছে বিশাল সম্রাটরা শেষ পর্যন্ত রাজ্যচ্যুত হয়েছেন। ইংলন্ডের রাজা হ্যানিবল ইতালির মত দেশকে মরুভূমিতে পরিণত করেছিলেন। লোকে তাঁকে বলত অপরাজেয়। ভীষণ অহংকারী রাজা ছিলেন তিনি। শেষে রোমানদের কাছে হেরে গিয়ে অপমানের জ্বালায় তিনি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। কত প্রাসাদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। কত ধনী জাহাজ ডুবিতে সর্বস্বান্ত হয়েছেন। কত বিশাল শিল্প প্রতিষ্ঠান আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। বিরাট স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে অকালে মারা গেছেন। তাই কোন কিছুই স্থায়ী নয়। অহংকার করে শুধু হাস্যাস্পদ হওয়া। তার চেয়ে বিনয়ী হয়ে চললে জীবনে সুখ পাওয়া যায়। লোকে চিরকাল তাঁদের মনে রাখে।

চরিত্র গঠনের আর একটি দিক হচ্ছে শ্রদ্ধা। গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ

জাগিয়ে রাখতে হবে। বিশেষ করে বাবা-মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা সৌজন্য ও বিদ্যা এই তিনবস্তু দান করলে ফুরিয়ে যায় না বরং তা দ্বিগুণ হয়ে ফিরে আসে।

প্রণামের মত এত সুন্দর প্রথাম সারা পৃথিবীতে নেই। প্রণামের মাধ্যমে গুরুজনদের শ্রদ্ধা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে তুমি নিজেকে শ্রদ্ধা জানালে। তুমি প্রণাম করলে কেননা, তোমার মধ্যে শিক্ষা আছে, সংস্কৃতি আছে, মূল্যবোধ আছে। তাই তুমি গুরুজনকে প্রণাম করলে। আজকাল প্রণাম উঠে যাচ্ছে। আমি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই। আমার ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে বিজয়ার পর মাত্র আটদশজন প্রণাম করে। বাকিরা মাথা নত করে না। অথচ রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'মাথানত করে দাও হে আমার তোমার চরণ ধূলার তলে। সকল অহংকার আমার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।

প্রণাম করার মধ্যে বিনয় প্রকাশ পায়। প্রকাশ পায় শ্রদ্ধা জানাবার মত মানসিকতা। তুমি যদি গুরুজনদের প্রণাম করে তাঁরাও তোমার প্রতি খুশি হবেন।

ঔদ্ধত্য প্রকাশ করা কোন বড় কিছু করা নয়। মা বাবার মনে কষ্ট দেওয়া, তাদের কথার অবাধ্য হওয়া ও মুখে মুখে কথা বলা গর্ব করার মত কোন বিষয় নয়। বরং ভক্তি শ্রদ্ধা বিনয় আনুগত্য দেখানোই কঠিন। যারা বড় হয়েছে তাদের প্রত্যেকের চরিত্রে একটা সাধারণ গুণ লক্ষ্য করা গেছে। সেটি মা-বাবাকে ভালবাসা। স্যার গুরুদাস হাইকোর্টের জজ হয়েছিলেন। রোজ মাকে প্রণাম করে আদালতে যেতেন। বিদ্যাসাগর মায়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দামোদর সাঁতরে বাড়ি গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফ্ফর খান মায়ের জন্য বিলেতে পড়তে যাননি। বাবা-মাকে দেখার জন্য আমি বিলেত থেকে দেশে ফিরে এসেছিলাম। সে দেশে পাকাপাকি বাস করিনি। স্যর আশুতোষও মায়ের কষ্ট হবে বলে রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্য অভিষেকে যাবার আমন্ত্রণ পর্যন্ত গ্রহণ করেননি।

প্রথমে সীমান্ত গান্ধীর কথা বলি। সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফ্ফুর খান ছিলেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের লোক। এটি এখন পাকিস্তানে। এই অঞ্চলে পাঠানদের বাস।

প্রথমে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে তিনি খিলাফৎ আন্দোলনে যোগ দিয়ে প্রথম কারাবরণ করেন। খান আবদুল গফ্ফর খান চেয়েছিলেন পাঠানদের মধ্যে

এক জাতীয় জাগরণ।

আর জাগরণ আনতে গেলে পাঠানদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করা সে সময় বড় প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন ছিল সামাজিক কুপ্রথা দূর করা। পাঠানদের মধ্যে সে সময় একতা ছিল না। পরস্পরের মধ্যে বিবাদ, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, খুনজখম লেগেই থাকত। কথায় কথায় এক গোষ্ঠী আর এক গোষ্ঠীর লোকের ওপর গুলি চালাতো। প্রত্যেকের কাঁধেই থাকত বন্দুক।

খান সাহেব ঠিক করলেন, পাঠানদের গঠনমূলক কাজে নিয়োগ করতে হবে। তিনি সেজন্য একটি সংগঠন করলেন। সংগঠনের নাম দিলেন খুদাই খিদমৎকার অর্থাৎ খোদা তথা ঈশ্বরের সেবক।

যারা খুদাই খিদমৎকারের সদস্য হতে চাইত তাদের সবাইকে এই শপথ বাক্যটি পাঠ করতে হত।

'আমি খোদার সেবক। খোদা আমাদের সেবা চান না। তিনি চান তাঁর সৃষ্টিকে সবাই ভালবাসুক। আমি ঈশ্বরের নামে সমস্ত মানুষকে ভালবাসব।

আমি প্রতিজ্ঞা করছি কোন হিংসাত্মক কাজের মধ্যে আমি জড়িত থাকব না। কখনও প্রতিশোধ নেবো না। আমি প্রতিজ্ঞা করছি যারা আমার ওপর অত্যাচার করছে বা আমার প্রতি নিষ্ঠুরতা দেখাচ্ছে তাদের ক্ষমা করব।

আমি কোনও দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও ঝগড়ার মধ্যে যাবো না। শত্রু সৃষ্টি

করবো না।

আমি সমাজবিরোধী নানা প্রথা ও অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকব।

আমি খুব সাদাসিধে জীবনযাপন করব।

ধর্ম অনুশীলন করবো। সমস্ত খারাপ কাজ পরিহার করবো।

আমি ভাল ব্যবসা করবো। অলস জীবনযাপন করবো না। দিনে অন্তত দু ঘন্টা সমাজের কাজে ব্যয় করবো।'

খুদাই খিদমৎকার ধীরে ধীরে এক আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল। এই ব্যাপারে খান সাহেবের আদর্শ ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। মহাত্মার অহিংসাকে তিনি জীবনে গ্রহণ করেছিলেন বলে দেশের লোক তাঁকে বলতো সীমান্ত গান্ধী। গান্ধীজীর মতই তিনি খুদাই খিদমৎকারদের নিয়ে বিরাট অহিংস আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। নিগৃহীত হয়েছিলেন! তার অনুগামীদের ওপর অসহ্য নিপীড়ন করেছে পুলিশ। গান্ধীজীর মতই এই মানুষটি দেশ বিভাগের বিরোধিতা করেছেন।

এবার সীমান্ত গান্ধী খান সাহেবের ছোটবেলার দুটো ঘটনার কথা বলি। এই দুটো কাহিনীই তিনি নিজে তাঁর আত্মজীবনীতে লিখে গেছেন।

পেশোয়ারের মিউনিসিপ্যাল স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে আবদুল গফ্‌ফর খান মিশন স্কুলে পড়াশোনা করেন। স্কুলে পড়তে পড়তেই খান সাহেবের ইচ্ছা হয় সেনাবিভাগে যোগ দেবেন। সুতরাং বাবা-মায়ের সঙ্গে পরামর্শ না করে তিনি চুপি চুপি সেনাবিভাগে সরাসরি ভর্তি হবার জন্য আবেদন পাঠিয়ে দেন। ঠিক সময় তিনি চিঠি পেয়ে যান যে তাঁকে নিয়োগ কেন্দ্রে পরীক্ষার জন্য ডাকা হয়েছে।

নিয়োগ কেন্দ্রে তিনি যথারীতি হাজির হন। সে সময় খুব বড়লোকের ছেলেরাই সেনাবিভাগে সরাসরি অফিসার হয়ে ঢুকতেন। তবে চট করে তাদের পক্ষেও সেনাবিভাগে ঢোকা মুশকিল ছিল।

কিন্তু খান সাহেবের চেহারা দেখে সাহেব অফিসারের তাঁকে খুব পছন্দ হয়। বাবর কাছে সব খুলে বলতেই বাবাও খুশি হলেন। সেনাবিভাগে অত ভাল চাকরি পেতে চলেছেন, তাঁকে পায় কে! এমন সময় একটা ঘটনা ঘটল।

খান সাহেবের ভাষাতেই বলি—

একদিন আমি পেশোয়ারে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। বন্ধুটি সেনাবিভাগের এক অফিসার। আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে গল্প করছি। এমন

সময় এক ইংরেজ লেফটেন্যান্ট (নিচু পদের অফিসার) সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। বন্ধুটির মাথায় টুপি ছিল না। দেখা যাচ্ছিল সে খুব ফ্যাশন করে চুল কেটেছে। অমনি তারা মাথা দেখে ইংরেজ লেটটেন্যান্ট রেগে গিয়ে বলল, তুমি সাহেব হতে চাও তাই না? তাই সাহেবের মত চুল কেটেছ, আহাম্মক কোথাকার। আমার বন্ধুর মুখ দিয়ে আর কথা সরল না। আমি দেখলাম যে আর্মিতে যোগ দিলে সামান্য কারণে আমাকেও ইংরেজ অফিসারের বিদ্রূপ সহ্য করতে হবে। আমি আর আর্মিতে যোগ দেব না ঠিক করলাম।

বাবা আমাকে খুব বকাবকি করলেন। এমন একটা সুযোগ পেয়ে আমি কিনা হাতছাড়া করলাম। আমার দাদা ইংল্যান্ডে ডাক্তারি পড়তে গিয়েছিলেন। আমি তাঁকে সব খুলে লিখলাম। তিনি বাবাকে সব বুঝিয়ে চিঠি লিখলেন। আমি বাবার ইস্কুলে ভর্তি হলাম। এই ইস্কুল সে ইস্কুল করে সবশেষে পেশোয়ারের স্কুল থেকে পাস করে আলিগড়ে গিয়ে কলেজে ভর্তি হলাম।

গরমের ছুটিতে বাড়ি এসে বাবার কাছে জানতে পারলাম, দাদা ইংল্যান্ড থেকে চিঠি লিখেছেন। আমায় লন্ডন পাঠিয়ে দিতে বলেছেন। তিনি আমায় এঞ্জিনিয়ারিং ক্লাসে ভর্তি করে দেবেন। বাবা আমাকে তিন হাজার টাকা দিলেন বিদেশ যাওয়ার খরচা-খরচা বাবদ। তারপর মায়ের কাছে অনুমতি চাইতে গেলাম।

আমি মাকে বললাম, মা আমি যাবো?

আমার কথা শুনে মা কাঁদতে লাগলেন।

মাকে আমি বোঝাতে লাগলাম, আমাকে যেতেই হবে। বললুম, মা আমাদের দেশের অবস্থা তো দেখছো। ব্রিটিশরা বিভেদের বীজ পুঁতে গেছে। নির্দোষ লোকদের ধরে আদালতে হাজির করা হচ্ছে। যারা কোনও অপরাধ করেনি, তাদের মেরে ফেলা হচ্ছে। আর আমাদের ভেতরকার দলাদলির জন্য অপরাধীরা কখনই সাজা পাচ্ছে না। এদেশে কারও জীবন নিরাপদ নয় মা।

কিন্তু মা কোনও যুক্তি-তর্ক মানলেন না। অনেকে মাকে বলেছিলেন, তোমার এক ছেলে চলে গেছে। আর এক ছেলেও যদি বাইরে চলে যায় তাহলে বুড়ো বয়সে তোমাকে দেখবে কে?

মা বললেন, আমার এখন মাত্র দুটি ছেলে। একটি ছেলে আগেই মারা গেছে। একজন বিলেতে। তোকে ছেড়ে আমি কিছুতেই থাকতে পারব না।

মায়ের চোখে জল দেখে খান আবদুল গফ্‌ফর খান বিদেশে যাওয়ার

সঙ্কল্প ত্যাগ করলেন। তিনি সেদিনই ঠিক করলেন মায়ের মনে কষ্ট দিয়ে কিছু করবেন না। দেশে থেকে দেশের কাজ করবেন। মায়ের কথা অগ্রাহ্য করে সেদিন তিনি যদি বিলেত চলে যেতেন তাহলে আমরা বোধ হয় একজন বড় স্বাধীনতা সংগ্রামীকে হারাতাম।

মায়ের আশীর্বাদই সন্তানের জীবনে বড় সম্পদ। দেখবে এই আশীর্বাদ পেলে কারও ক্ষতি তো হয়ই না বরং তার ভালই হয়। আমি তো কোন মাতৃভক্ত ছেলের খারাপ হতে দেখিনি। দেখেছি বরং তুমুল বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেতে।

চরিত্র গঠনের আর একটি দিক হল তেজস্বী হওয়া। আত্মসম্মানকে সবার উপরে স্থান দেওয়া।

তেজস্বিতা আর আত্মসম্মান বোধ না থাকলে কেউ বড়মাপের মানুষ হতে পারে না। শুধু লেখাপড়া শিখলেই বড় হওয়া যায় না। বড় চাকরি করলেই বড় হয় না মানুষ। বড় হওয়ার জন্য চাই বড় চরিত্র। তেজস্বিতা আর আত্মসম্মান বোধ ওই বড় চরিত্রবলগুলির দুটি।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় চরিত্রে এই তেজস্বিতা আর আত্মসম্মানবোধ একটু বেশি পরিমাণে ছিল বলেই লোকে তাঁকে বলত বাংলার বাঘ।

বাঘের মধ্যে আছে গাম্ভীর্য। আছে চারপাশের সব কিছুকে উপেক্ষা করে একা একা চলার ক্ষমতা। আর তেজস্বিতা। বাঘকে সহজে বশ করা সম্ভব নয়।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ব্রিটিশদের কাছ থেকে নাইট উপাধি পেয়েছিলেন। নাইট উপাধি যাঁরা পান, তাঁদের নামের আগে লেখা হয় স্যর। যেমন স্যার উইনস্টন চার্চিল, স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও নাইট উপাধি পেয়েছিলেন। কিন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি এই উপাধি ত্যাগ করেন।

ব্রিটিশদের কাছ থেকে রাজসম্মান পেয়েও স্যর আশুতোষ কিন্তু ব্রিটিশদের অন্ধ ভক্ত ছিলেন না। দেশের ও দেশবাসীর উন্নতির জন্য তিনি যা ভাল বুঝেছেন তা করেছেন।

আশুতোষ ছিলেন প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাঁকে দিয়ে কোনও অন্যায় কাজ করিয়ে নেওয়া যেত না। তিনি ছিলেন বজ্রের মত কঠোর আর

অন্যদিকে কুসুমের মত কোমল।

স্যর আশুতোষ কলকাতার হাইকোর্টের একজন কৃতী বিচারপতি ছিলেন। ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।

প্রথমে ১৯০৬ থেকে দীর্ঘ আট বছর একনাগাড়ে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হন। ১৯২১ সালে তিনি আর একবার উপাচার্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু সরকারের সঙ্গে তাঁর বনিবনা না হওয়ায় সরকার তাঁকে পরের বার আর উপাচার্যের পদে নিযুক্ত করেননি।

সরকারের সঙ্গে তাঁর বিরোধের কারণ আশুতোষ চেয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে সরকার নাক গলাবে না। কিন্তু সরকার চেয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়কে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে।

১৯২৩ সালে লর্ড লিটন যখন বাংলার লাটসাহের সেসময় তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসাবে সমাবর্তন ভাষণ দিতে আসেন। তাঁর ভাষণে লিটন বুঝিয়ে দেন যে বিশ্ববিদ্যালয় ষোল আনা স্বাধীনতা পেতে পারে না কারণ সরকারি টাকাতেই বিশ্ববিদ্যালয় চলে।

আশুতোষ তাঁর ভাষণে লাটসাহেবের মুখের ওপর বলেন, জাতীয় শিক্ষা ও চরিত্র গড়ে তুলবার জন্য আমি বরাবর চেয়ে এসেছি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা। বাইরে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে হস্তক্ষেপ করা অন্যায়।

এই কথা শুনে লর্ড লিটন রেগে গেলেন। তিনি একটি চিঠিতে আশুতোষকে লিখলেন, আপনি এ পর্যন্ত আমাদের কোনও সাহায্য করেননি। বরং আমাদের কাজে বাধা দিয়ে এসেছেন। আমরা ভেবেছিলাম আপনি সরকারের কথা শুনে কাজ করবেন। যদি সরকারের কথা শুনে কাজ করতে রাজি থাকেন তাহলে আপনাকে আবার উপচার্যের পদে নিয়োগ করার ব্যবস্থা করতে পারি।

এর উত্তরে আশুতোষ যে চিঠি লিখলেন, তাতে বড় লাটকে মহামান্য মহাশয় বলে সম্বোধন না করে লিখলেন—প্রিয় লিটন। আমার আগের উপাচার্যরা কেউ সরকারের আদেশমত কাজ করেননি। আমি তাঁদের পথ অনুসরণ করেই চলেছি। আমি কখনও লাটসাহেব বা মন্ত্রীদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিনি। আপনি এবং আপনার মন্ত্রী যে আমাকে সহ্য করতে পারছে না তাতে আমি অবাক হইনি। এদেশে এমন একজন উপাচার্য পাওয়া আপনাদের পক্ষে অসম্ভব হবে না যিনি আপনাদের আজ্ঞাধীন হয়ে আদেশ প্রতিফলন

করবেন এবং সেনেটে গুপ্তচরের কাজ করবেন আর আপনাদের অন্তরঙ্গ হবেন।

আপনি যে অপমানসূচক প্রস্তাব করে আমাকে ভাইস-চ্যান্সেলরের পদ দিতে চাইছেন তা আমি প্রত্যাখান করছি।

এই হলেন আশুতোষ। এজন্যই তাঁকে বলা হত বাংলার বাঘ।

আশুতোষ সে সময়কার এক উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিত। হাইকোর্টের জজ। কিন্তু তাঁর জীবনযাত্রা ছিল সহজ সরল।

একটি সাধারণ ধুতি ও একটি খাটো কোর্ট পরে তিনি সারা দেশ ঘুরে বেড়াতেন। এমনকি হাইকোর্টের ভেতরেও এজলাশের কাজ হয়ে গেলে কোট প্যান্ট ছেড়ে ধুতি পরে নিতেন।

একবার আশুতোষ গেছেন মহীশুরে সমাবর্তন সভায় ভাষণ দেবার জন্য। স্বয়ং মহীশুরের মহারাজা তাঁকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছেন। উঠেছেন রাজার অতিথিশালায়।

সমাবর্তন সভায় নিয়ে যাবার জন্য প্রধানমন্ত্রী এলেন। সঙ্গে নিয়ে এলেন একটি পাগড়ি আশুতোষকে পরিয়ে দেবার জন্য। ওই পাগড়ি পরে তবে সমাবর্তনে যেতে হবে। আশুতোষ বেঁকে বসলেন।

না, আমি পাগড়ি পরবো না।

প্রধানমন্ত্রী বললেন, স্যর, এটা এ রাজ্যের নিয়ম। পাগড়ি পরে সভায় যেতে হয়। কারণ মহারাজা যেখানে থাকবেন সেখানে খালি মাথায় কারও যাওয়া চলবে না।

আশুতোষ বললেন, কিন্তু আমার রাজ্যের নিয়ম পাগড়ি না পরা। এ নিয়মের আমি ব্যতিক্রম ঘটাতে পারি না। বিনা পাগড়িতে যদি সমাবর্তনে না যাওয়া যায় তাহলে আমি যাবো না। আপনি মহারাজাকে গিয়ে বলে আসুন।

প্রধানমন্ত্রী বিপদ বুঝে মহারাজাকে গিয়ে সব বললেন। মহারাজা তাড়াতাড়ি ছুটে এসে বললেন—আপনাকে পাগড়ি পরতে হবে না। আপনি এমনি খালি মাথায় সভায় চলুন। আশুতোষ খালি মাথায় সভায় গেলেন।

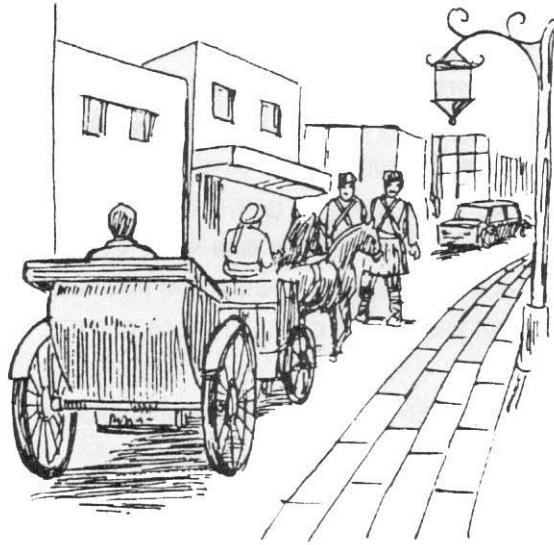

আর একবার হাইকোর্টের কাজ সেরে ঘোড়ার গাড়ি করে আশুতোষ রেড রোড ধরে ভবানীপুরের বাড়ি ফিরছেন। হঠাৎ এক পুলিশ সার্জেন এসে তাঁর গাড়ি আটকাল। বলল, এই রাস্তা দিয়ে আপনাদের যাবার অনুমতি নেই। শুধু ইওরোপীয়রাই এই রাস্তা দিয়ে যেতে পারবেন।

আশুতোষ অবাক হয়ে বললেন, তুমি ঠিক বলছ, এই রাস্তা শুধু সাহেবদের জন্য?

হ্যাঁ স্যর।

আশুতোষ গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে অন্য রাস্তা করে বাড়ি এলেন। বাড়ি এসেই সোজা লাটসাহেবকে ফোন।

বললেন, এটা কী হচ্ছে? আমাদের রাস্তা দিয়ে আমরা যেতে পারব না। এই বৈষম্য চলছে কী করে?

বড়লাট অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, এই রাস্তা সবসময় আপনাদের জন্য খোলা। আপনি এই রাস্তা দিয়ে যেতে পারেন।

কিন্তু আমি একা আমার জন্য এ সুযোগ চাই না। আমি চাই আপনি রেড রোড সবার জন্য খুলে দেবেন।

লাটসাহেব রাজি না হয়ে পারলেন না। রেড রোড থেকে সব বাধা দূর

হয়ে গেল।

ইংল্যান্ডের রাজা সপ্তম ওডওয়ার্ডের রাজ্য অভিষেক হবে। ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন। কলকাতা তখন ভারতের রাজধানী। কার্জন কলকাতার কিছু বিশিষ্ট ভারতীয়কে রাজ্য অভিষেক দেখার জন্য ব্রিটিশ সরকারের আমন্ত্রণে লন্ডন পাঠাতে চাইলেন। তার মধ্যে আশুতোষের নাম ছিল। কিন্তু আশুতোষের মায়ের নিষেধ ছিল। ছেলে যেন বিদেশে না যায়।

মাকে ছেড়ে থাকতে হবে বলে তিনি সেসময় মনঃকষ্টে ভুগছিলেন।

বলেছিলেন, তিনি বিদেশে যাবেন না। আমার মায়ের নিষেধ আছে।

সরকারি অফিসার জবাব দিলেন, আপনার মাকে বলবেন 'ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধির আদেশে আপনাকে বিলেত যেতে হবেই।'

আশুতোষের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। তিনি বললেন, আমার মা কিন্তু একথা স্বীকার করে না না যে তাঁর ছেলেকে হুকুম করার অধিকার একমাত্র তাঁর ছাড়া অন্য কারও আছে।

আশুতোষের কাছ থেকে এই জবাব পেয়ে ওই রাজকর্মচারী আর কিছু বলতে পারেননি।❑

।। আট ।।

জ্ঞানের খোঁজে

তোমাদের এমন হয় নিশ্চয়ই। ক্লাসে মাস্টারমশাই পড়ালেন। তা বুঝতে পারলে না হয়তো। কিন্তু কোন প্রশ্ন করছ না। অথবা মনের মধ্যে নানা প্রশ্ন জাগছে, উত্তর খুঁজে পাচ্ছ না। তবু প্রশ্ন নেই। মুখে কথা ফুটছে না। কিন্তু কেন?

অনেকে লজ্জা পায় প্রশ্ন করতে। কী জানি উনি কী মনে করবেন। হয়তো রেগে যাবেন। অথবা এমন প্রশ্ন করবো যে বন্ধুরা বোকা ভেবে হেসে উঠবে। আবার কারও মনে কোন প্রশ্নই জেগে উঠছে না।

কিন্তু প্রশ্ন করলে কেউ কিছু মনে করে না বরং খুশিই হন।

এছাড়া যার মনে কোন প্রশ্ন নেই তার মধ্যে কোন সৃষ্টিশীল মন নেই। বড় হবার আকাঙ্ক্ষাও নেই।

প্রশ্ন তখনই জাগবে যদি ভাল করে শোন। মাস্টারমশাই ক্লাসে যা বলছেন সেটা মন দিয়ে শুনতে হবে। জ্ঞান বাড়াবার জন্য শুধু ক্লাসের পড়া করলেন চলবে না। বাইরের বক্তৃতাও শুনতে হবে। ধরো কোন সভায় কোন বিখ্যাত লোক বক্তৃতা করছেন—একটু উঁচু ক্লাসে উঠলে সে বক্তৃতা শুনতে যাবে। তারপর যদি কোন কথা বুঝতে না পারো বক্তৃতার শেষে সোজা তাঁর কাছে গিয়ে প্রশ্ন করবে। স্যার আপনি এই কথাটা বলেছেন, আমি ওই জাগায়টা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

মনের সৃজনশীলতা বলতে আমরা বুঝি কোন বিষয় শুধু বোঝা নয় ওই বিষয়কে অবলম্বন করে মনের মধ্যে নানা প্রশ্ন জাগা ও তার সমাধান খোঁজা। নয়তো ওই বিষয়কে কেন্দ্র করে বিষয়ান্তরে চলে যাবার ক্ষমতা। আচ্ছা তোমার মধ্যে এই প্রশ্ন কি কখনও আসে না? সূর্যের এত তাপ কেন? তারারা আকাশে এমন জ্বলজ্বল করে জ্বলে কেন? তারা কী চিরকালই এমন জ্বলছে, না একটা সময়ের পর নিভে যায়।

মানুষ আগে বানর ছিল। বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তারা মানুষ হয়েছে।

কিন্তু সব বানর মানুষ হলনা কেন? এখন যে সব বানররা আছে তারাও কী একদিন মানুষ হবে? অথবা ভারতে ইংরেজরা না এসে যদি ফরাসিরা আসত তাহলে কী হত? কেন ফরাসিরা ভারত দখল করতে পারল না শুধু ইংরেজরা পারল?

অথবা দেশের সব মানুষের দারিদ্র্য ঘোচাতে গেলে কী করতে হবে? তুমি যদি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হও তুমি কী কী কাজ করবে? তুমি যদি লটারিতে এক কোটি টাকা পাও তাহলে কী করবে ওই টাকা নিয়ে?

তবে একটা কথা জেনে রেখে দাও—বড় হতে গেলে বই পড়তে হবে। প্রথমে না হয় গোয়েন্দা গল্প, হাসির গল্প ভূতের গল্প দিয়ে পড়ার অভ্যাস তৈরি করো। তারপর ধীরে ধীরে জীবনী, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও রাজনীতির বই পড়বে। ভ্রমণকাহিনী পড়লে তার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে জ্ঞান হবে। কোন বড় মানুষের আত্মজীবনী পড়লে জানতে পারবে তাঁদের কঠোর জীবন সংগ্রামের কথা। তবে এমন বই শুধু পড়বে যা থেকে জ্ঞান অর্জন হয়। কিছু নতুন কথা জানা যায়। রোজ খবরের কাগজ পড়বে তা না হলে সাধারণ জ্ঞানে পিছিয়ে পড়বে। দেশের ও বিদেশের কোথায় কী হচ্ছে জানা চাই। পয়সা জমিয়ে আজেবাজে কিছু না কিনে বই কিনবে। আমি স্কুল জীবনে যেখানে যা পয়সা পেতাম জমিয়ে বই কিনতাম। আমার একটা লাইব্রেরি হয়ে গিয়েছিল। এখন আমার বাড়িতে বেশ বড় লাইব্রেরি হয়েছে। তাতে হাজার দুয়েক বই আছে। আমাদের সময় ছোটদের ভাল ভাল পত্রিকা ছিল মৌচাক, শিশুসাথী, শুকতারা, রং মশাল এইসব। আমি অনেকগুলির গ্রাহক ছিলাম। এখন শুধু ভাল ছোটদের ভাল পত্রিকা বলতে শুকতারা আর কিশোর ভারতীই আছে।

যাঁরা বড় হয়েছেন, ছোটবেলা থেকেই তাঁদের জ্ঞান পিপাসা প্রবল ছিল।

আব্রাহাম লিঙ্কন ছোটবেলায় খুব গরিব ছিলেন। তাঁদের বাড়িতে বাইবেল ছাড়া কোন বই ছিল না। আব্রাহাম ছোটবেলায় ওই বাইবেলটি পড়ে মুখস্থ করে ফেললেন। কিন্তু আর তো বই বাড়িতে নেই। অথচ আব্রাহামের মধ্যে বই পড়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জেগেছে। লিঙ্কন একদিন জানতে পারলেন নদীর ওপারে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে অনেক বই আছে। নদী পারাপারের খেয়ার পয়সা তাঁর ছিল না। তিনি সাঁতরে নদী পার হয়ে ভদ্রলোকের বাড়ি বই পড়তে গিয়েছিলেন।

একবার আব্রাহামের বাবা একজনের বাড়ি থেকে তাঁকে একটি বই এনে দিয়েছিলেন। বইটির নাম Pilgrims Progress. এই বইটি তিনি সব সময় পড়তেন। আর এক বন্ধু উপহার দিল ঈশপের গল্প। এই বইটিও তিনি বার বার পড়তেন। আব্রাহাম চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত বেশি লেখাপড়া শিখতে পারেননি। যোগবিয়োগ গুণ ভাগ পর্যন্ত শিখেছিলেন। এরপর পাঁচ মাইল দূরে একটি স্কুলে কদিন গিয়ে আর যাননি। চোদ্দ-পনের বছর বয়সের পর তিনি আর ইস্কুলে পড়েননি। যা পড়েছেন বাড়ি বসে। কারণ পড়াশোনা চালাবার মত তাঁর আর্থিক সঙ্গতি ছিল না। তাঁকে ছোটবেলা থেকে মজুরের কাজ করতে হত। তিনি খেয়া নৌকার মাঝির চাকরি নিয়েছিলেন। মাসে বেতন পেতেন ছ' ডলার। রাতে বাড়ি ফিরে তিনি বই পড়তেন। এরপর আব্রাহাম এক মুদির দোকানে কাজ নেন। আমেরিকায় গিয়ে আমি লিঙ্কনের বাড়ি দেখেছি। কাঠের ছোট্ট বাড়ি। আর তিনি ইলিনয়তে যে মুদির দোকানে কাজ করতেন সেটিও রেখে দেওয়া হয়েছে। মুদির দোকানের মালিক একটি খবরের কাগজ নিতেন। আব্রাহাম সেটি পড়তেন। লিঙ্কন এরপর এক ব্যবসায়ীর চাকরি নিয়ে আঠারশ মাইল দূরে নিউ আর্লিয়েন্স শহরে নৌকায় করে মাল বিক্রি করতে যান। এই শহরে এসে আব্রাহাম দেখেন এখানে গরু ছাগলের মত মানুষ বিক্রি করা হচ্ছে।

এই সময় তাঁর হাতে একটি আইনের বই এল। তিনি আইনের বইটি পড়ে ফেললেন। তাঁর খুব ইচ্ছে হল তিনি উকিল হবেন। একদিন তিনি ১৫ মাইল দূরে হেঁটে গিয়ে স্থানীয় আদালতে গিয়ে দেখে এলেন উকিলরা কেমন করে সওয়াল-জবাব করে।

এরপর ইলিনয় প্রদেশে নিউ আর্লিয়েন্স শহরে আব্রাহাম একটি মুদির দোকানে চাকরি নিয়ে চলে আসেন। এখানে এসে অবসর সময় তিনি ব্যাকরণ শেখা শুরু করেন। দোকানে বসে তিনি সাহিত্যের বই পড়তেন। মাঝে মাঝে সাহিত্যসভায় বক্তৃতাও দিতেন।

কিন্তু মুদির দোকানটি বন্ধ হয়ে গেল। আব্রাহামের চাকরি গেল। তিনি তখন কামারের ব্যবসা করবেন ঠিক করলেন। কিন্তু সে সময় তাঁর এক বন্ধু বললেন। তুমি কামারের কাজ করে কী করবে? আমরা তোমাকে এম.এল.এ. দাঁড় করার ঠিক করেছি।

আব্রাহাম বললেন, বন্ধু। কেন ঠাট্টা করছ? আমি মুখ্যু গরিব মানুষ।

আমি কি এম.এল.এ. হবার যোগ্য? বন্ধু বললেন—না, না, তুমি একজন খাঁটি লোক। ভাল বক্তৃতা দিতে পারো। সবাই তোমাকে চায়। তাঁরা জোর করে আব্রাহামকে ভোটে দাঁড় করান। তিনি প্রচুর ভোটে জিতে গেলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৫। আব্রাহাম যখন আইনসভার প্রথম সদস্য হলেন তখন তাঁর পোশাক কেনার টাকা নেই। কারণ তাঁর যে জামাকাপড় তা পরে আইনসভায় যাওয়া যায় না। এক বন্ধুর কাছে ধার করে দুশো ডলার নিয়ে পোশাক কিনলেন।

প্রথম যে বছর তিনি এম.এল.এ. হলেন সে বছর আর একজন এম.এল.এ. তাঁকে বলল—আপনি তো খুব ভাল বক্তৃতা দেন। আপনি প্রাইভেটে আইন পরীক্ষা দিন। আব্রাহাম বললেন—আমার অত বই কেনার টাকা নেই। ভদ্রলোক নিজে উকিল। তিনি বললেন—তুমি আমার কাছ থেকে বই নিয়ে যেও। পড়ে ফেরত দিও।

উকিল বন্ধুর বাড়ি ২২ মাইল দূরে। তখন গাড়ি ঘোড়া ছিল না। আব্রাহাম মোটামোটা বই মাথায় করে বাইশ মাইল দূর থেকে হেঁটে বাড়ি ফিরতেন। এইভাবে আইন পরীক্ষা দিয়ে তিনি ওকালতি শুরু করেন। অল্পদিনের মধ্যে ওকালতিতে তিনি উন্নতি করেন।

যাদের পড়লে মনে থাকে না :

আমরা যখন দেশের বাড়ি থাকতাম তখন আমাদের লাগোয়া পাশের ঘরে একটি ইস্কুলের ছেলে থাকত। তার নাম মদন। মদন দিনরাত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ত। তার পড়ার ঠেলায় কান ঝালাপালা হবার যোগাড়।

কিন্তু মদন এত পড়েও অ্যানুয়াল পরীক্ষায় পাস করতে পারত না।

আমার ধারণা যারা ফেল করে তাদের বেশির ভাগই যারা পাস করে তাদের চেয়ে বেশি পড়ে। এত পড়েও ছেলেমেয়েরা ফেল করে কেন? এর একটা কারণ আমাদের দেশে মুখস্থ বিদ্যার ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়। যাদের মুখস্থ করার ক্ষমতা আছে তারা যদি কিছু না বুঝেও মুখস্থ করা উত্তর লিখে দেয়, তাহলে ভালভাবেই পাস করে। আর যারা মুখস্থ করতে পারে না—ভুলভাল লিখে দিয়ে চলে আসে তারা ফেল করে।

কিছু মনে রাখাকে আমরা স্মৃতিশক্তি বলি। এই স্মৃতিশক্তি কিন্তু মেধার

প্রথম লক্ষণ। পণ্ডিত বলে পরিচিত হতে গেলে অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী হতেই হবে। বিভিন্ন শাস্ত্র শুধু পড়লেই চলবে না, সেগুলি মুখস্থ করে প্রয়োজনের সময় তা থেকে উদ্ধৃতি দিতে হবে। পরীক্ষায় যারা ভাল নম্বর পায় তাদের বিভিন্ন বিষয় মুখস্থ রাখতেই হয়। চার-পাঁচটা বই পড়ে সেইসব বই থেকে দরকারি বিষয়গুলি এক সঙ্গে জড় করে লিখতে হয়। মাঝে মাঝে উদ্ধৃতি দিতে হয়। গণিতের ফর্মূলা মুখস্থ রাখতে হয়। মুখস্থ রাখতে হয় গোটা অভিধানের বানান, গ্রামার ও ব্যাকরণের নিয়মকানুন। বিজ্ঞানের যাবতীয় সূত্র। ইংরেজি ও বাংলা কবিতা।

যিনি ছাত্রজীবন শেষ করে কর্মজীবনেও এইসব মনে রাখতে পারেন তিনি তত কৃতী হন। একবার ভাবো ডাক্তারবাবু এসে রোগী দেখে খস খস করে ওষুধের নাম লিখে দিচ্ছেন। আর কী সব বিদ্ঘুটে নাম। এই রকম হাজার ওষুধের নাম মুখস্থ করতে হয়। এছাড়া নিত্য নতুন ওষুধ বেরুচ্ছে প্রত্যেকের নাম মনে রাখতে হচ্ছে।

উকিলদের মনে রাখতে হবে বিভিন্ন ধারার আইন। এই সব ধারার সংখ্যা কী কম? নিত্য নতুন ধারা আবার যুক্ত হচ্ছে।

যাঁরা অভিনয় করে, আবৃত্তি করে, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা জিতে নেয় তাদের স্মৃতিশক্তি দেখে তাজ্জব হয়ে যাই। সমস্ত নাটক তারা মুখস্থ বলে যাচ্ছে। কোন প্রম্পটার থাকছে না। একজন অভিনেতাকে দেখলাম গোটা মেঘনাদবধ কাব্য মুখস্থ করে গেলেন।

আগে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা পুরো বেদ মুখস্থ বলতে পারতেন। এই রকম দুটি বেদ যাদের মুখস্থ হত তাঁরা উপাধি পেতেন দ্বিবেদী। তিন বেদ হলে ত্রিবেদী। চার বেদ হলে চতুর্বেদী।

মজা হচ্ছে মুখস্থ করতে জানলেই কিন্তু মেধাবী হওয়া যায় না। তাহলে তো একজন অভিনেতাই আইজ্যাক নিউটন হতে পারত।

মেধা হচ্ছে স্মৃতিকে কাজে লাগিয়ে নিজস্ব সৃজনীশক্তি ও উদ্ভাবনী শক্তি গড়ে তোলা। সেজন্য চাই প্রখর বিশ্লেষণী ক্ষমতা। প্রতিটি বিষয় বুঝতে পারা। সবাই সব বোঝে না। একটু জটিল করে লিখলে সাধারণ মানুষ আর বুঝতে পারে না। তাছাড়া সব বিষয়ে সবার আগ্রহ থাকে না।

তবে মনীষীদের অসাধারণ স্মৃতিশক্তি থাকে। তোমরা পণ্ডিত নীরদ চন্দ্র চৌধুরীর নাম শুনেছ? উনি খুব বেশি বয়সে বিলেত চলে গিয়ে ইংরেজিতে

লিখে ইংরেজ লেখকদের সমতুল মর্যাদা পেয়েছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ের একবার পড়লেই তাঁর মনে থাকত। অসাধারণ তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল।

তোমাদের ইস্কুলে পড়াশোনায় ভাল ছেলে যারা তাদের দেখবে একবার পড়লেই মনে থাকে। এই জন্য তাদের বেশি পড়তে হয় না। আমাদের সময় আমাদের ক্লাসে ফার্স্ট বয় ছিল জগদীশ শিকদার। তাঁকে দেখতাম সব সময় আড্ডা দিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু পরীক্ষায় বসলেই ফার্স্ট। মেধানী ছেলেমেয়েদের মধ্যে যাদের মৌলিকতা বা সৃজনীশক্তি বেশি এবং যারা জটিল ও দুরূহ বিষয় চট করে বুঝতে পারে তারা জীবনে, আরও বড় হয়। জগদীশ চন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্র, বিজ্ঞানী সত্যেন বসু এই ধরনের মেধাবী ছিলেন স্যর আশুতোষ।

সত্যেন বসু মহাশয়কে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম। ১৯৭৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়। সাংবাদিকতার সূত্রে আমি অনেকবার তাঁর বাড়ি গিয়েছি।

সত্যেন বসু এমন একজন বিজ্ঞানী যিনি মনে করতেন বিজ্ঞানীকেও সাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহী হতে হবে। আর আমাদের দেশে ছেলেমেয়েদের বিজ্ঞান পড়াতে হবে মাতৃভাষায়। মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান পড়লে বিজ্ঞান ছেলেমেয়েদের চিরকাল মনে থাকবে।

সত্যেন বসু বলতেন, যে বলে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান পড়া যায় না—সে বিজ্ঞানও জানে না, বাংলাও জানে না।

সত্যেন বসু যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন তখন ছাত্রদের কাছে সহজ বাংলায় পদার্থবিদ্যার শক্ত শক্ত বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করতেন।

কলকাতার বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ নামে একটি সংগঠন আছে। ১৯৪৮ সালে এই সংগঠনটি তৈরি করেন অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

বিজ্ঞান পরিষদের অন্যতম কাজ হল মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান চর্চা করায় সাহায্য করা। শেষ জীবনে সত্যেন বসু এই বিজ্ঞান পরিষদ ও বাংলা বিজ্ঞান পত্রিকা জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন।

বিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকের ধারণা ছিল বাংলায় বিজ্ঞান পড়ানো যায় না।

কিন্তু সত্যেন বসু বলতেন, স্বাধীনতার যা কিছু সুফল তা যেন শুধু অল্পসংখ্যক শিক্ষিতের মধ্যে না থাকে দেশের সমস্ত মানুষের কাছে গিয়ে

পৌঁছয় সেটা দেখতে হবে। কয়েকজন মেধাবী বিজ্ঞানী নয়, যখন দেশের সব লোক বিজ্ঞান চিন্তা করবে তখনই দেশে বিজ্ঞান দানা বাঁধবে।

একবার জাপানে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ দেখলেন যে দুজন ভারতীয় বিজ্ঞানীর লেখা বিজ্ঞানের ওপর দুটি প্রবন্ধ জাপানিতে অনুবাদ হয়েছে। প্রবন্ধ দুটি সেখানকার বহু লোক পড়ার জন্য কিনছে।

সত্যেন বসুর খুব দুঃখ হল। জাপানের সাধারণ মানুষ জাপানি ভাষায় লেখা বলে বিজ্ঞান পড়তে পারছে। বুঝতেও পারছে। অথচ এই প্রবন্ধ দুটির কোন ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ হয়নি বলে দেশের লোক পড়তে পারল না।

বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান চর্চার কথা বহুকাল আগে বলে গিয়েছিলেন বিজ্ঞানী গ্যালিলিও।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদানন্দ রায়, রাজশেখর বসু প্রমুখ বাংলাতে সুন্দরভাবে বিজ্ঞানের কথা লিখে গেছেন।

১৮৯৪ সালে গোয়াবাগানে ২২, ঈশ্বর মিল লেনে সত্যেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাবা-মায়ের বড় ছেলে। ছোটবেলা থেকে অঙ্কে তিনি খুব ভাল ছিলেন। যে কোনও অঙ্ক কষে দিতে পারতেন বাবা কাজে বেরিয়ে গেলে ছেলে দুষ্টুমি বন্ধ করার জন্য তাকে কতগুলি অঙ্ক দিয়ে বলতেন, এগুলো করে রেখে দেবে। আমি ফিরে এসে দেখব। অমনি ছোট্ট সত্যেন্দ্রনাথ খুব আনন্দের সঙ্গে অঙ্কগুলো করতে বসতেন।

ছোটবেলা থেকে সত্যেন্দ্রনাথের নানা বিষয়ে পড়ার অসাধারণ আগ্রহ ছিল। বন্ধু-বান্ধবদের তিনি পড়া বুঝিতে দিতেন। একবার তিনি বই-এর পাতা ছিঁড়ে ফেলেছিলেন বলে মা খুব বকাবকি করলেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ অম্লান বদনে বললেন, আমার বই তো মুখস্থ মা। পাতাটার আর কী দরকার। সত্যি সত্যি তিনি পুরো পাতাটি হুবহু মুখস্থ বলে গেলেন।

শুধু বিজ্ঞান নয়, যে কোনও বিষয়ের ওপর সত্যেনের ছিল দখল। একবার যখন কলেজে পড়েন তখন কলেজের সহপাঠী ধুর্জটিপ্রসাদ এসে বলল সত্যেন ইতিহাসটা আমার মাথায় ঢুকছে না। কাল পরীক্ষা, কী যে করি।

সত্যেন বললেন, কাল ভোরে তোর বাড়ি গিয়ে তোকে ইতিহাস বুঝিয়ে দিয়ে আসব।

সত্যেন পরদিন ভোরে গিয়ে ধুর্জটিকে এমন জলের মত করে ইতিহাস বুঝিয়ে দিলেন যে ধুর্জটি খুব ভাল ফল করলেন।

হিন্দু স্কুলে যখন পড়েন তখন তাঁর অঙ্কের মাস্টারমশাই তাঁকে অঙ্কের পরীক্ষায় একশর মধ্যে একশ দশ দিয়েছিলেন। কারণ দশটা অঙ্ক করার কথা। সত্যেন্দ্রনাথ এগারটি অঙ্কই করে দিয়েছিলেন।

কলেজে ইংরাজিতে একবার নম্বর পেলেন ৬০-১০।

১০ নম্বর অতিরিক্ত কেন? না মাস্টারমশাই পার্সিভাল সাহেব বললেন, ওই দশ নম্বর দিলুম ওর নিজস্ব বক্তব্য লেখার জন্য। ওর মধ্যে আলাদা কিছু একটা আছে। বইতে যেটা আছে কখনও উগরে দেয় না।

স্মৃতিশক্তি অনুশীলনের সাহায্যে বাড়ানো যায়। তবে আমার মত বয়সে আর স্মৃতিশক্তি বাড়াতে পারবে না। কিন্তু ছোটরা ইচ্ছা করলেই নিয়মিত অনুশীলন করে মনে রাখার ক্ষমতা অর্জন করতে পারো। তা সে বীজগণিতের সূত্র, বিজ্ঞানের সূত্র কিংবা রবীন্দ্রনাথের দেবতার গ্রাস কবিতাটিই হোক। এস. জনসন বলেছেন, সত্যিকারের স্মৃতি হল মনোযোগ দেবার ক্ষমতা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা মনে রাখতে পারি না, ভাল করে শুনি না বলে। কারণ একজন সুস্থ মানুষের মস্তিষ্ক একটি বিশাল কম্পিউটারের মত। একজন কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ জন ভন নিউম্যান বলেছেন একজন মানুষ $১০^{২০}$ অর্থাৎ ১০×১০×১০ করে কুড়িটা দশ গুণ করলে যে পরিমাণ সংখ্যা দাঁড়ায় (অর্থাৎ ১০ এরপর উনিশটা শূন্য) তত পরিমাণ বিষয় মনে রাখতে পারে। মস্কোর লেলিন লাইব্রেরিতে যত বই আছে (এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় লাইব্রেরি) সব বই এর সারাংশ একজনের পক্ষে স্মৃতিতে ধরে রাখা সম্ভব।

আগেকার দিনের লোকদের স্মৃতিশক্তি অনেক বেশি ছিল। জুলিয়াস সিজার ও আলেকজান্ডারের ত্রিশ হাজার সৈন্য ছিল। তাঁরা প্রত্যেক সৈন্যের নাম জানতেন। সক্রেটিশের সময় এথেন্স শহরে দশ হাজার লোক বাস করতেন। সক্রেটিশ ওই দশ হাজার লোকের প্রত্যেকের নাম জানতেন। স্মৃতিশক্তির প্রখরতা নাম মনে রাখার ওপর অনেকটা নির্ভর করে। তুমি যত বেশি লোকের নাম মনে রাখবে ততই তোমার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে। ক্লাসের সব বন্ধুদের নাম ও পদবি দিয়ে পরীক্ষা শুরু করো। প্রথমে তোমার ক্লাসের বন্ধুদের নাম মনে রাখলে। এরপর অন্যান্য ক্লাসের ছেলেমেয়েদের যতজনের নাম মনে রাখা সম্ভব মনে রাখো। এইভাবে পাড়া প্রতিবেশি ও আত্মীয়

স্বজনের নামও মনে রাখা চেষ্টা করো। অনেক সময় আমরা পরিচিতদের ভাল নাম জানি না। ডলু মাসি, ফেলুমামা, নসুকাকা, মিনু বৌদি এই সব নামেই তাদের মনে রাখি। ডলু মাসির ভাল নাম যে সুপর্ণা বা বিনতা এটা মনে রাখা দরকার। সেই সঙ্গে বাড়ির ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর মুখস্থ যত বেশি রাখা যায় ততই ভাল। এগুলি বড় হয়ে কাজ দেবে। তুমি যদি অফিসে বড়সাহেব হও, কর্মচারীদের নামে চিনলে দেখবে তোমাকে সবাই খাতির করছে। আমেরিকানদের মধ্যে সুন্দর নিয়ম আছে। তারা পরিচিতদের প্রথম নাম ডাকে। ধরো তুমি বয়সে ছোট অথবা পদমর্যাদায় ছোট। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। তুমি জন টেলর নামের কোন ভদ্রলোককে অনায়াসে জন বলে ডাকতে পারো। সাংবাদিকতায়, জনসংযোগের কাজে, সেলস এর কাজে তুমি যত লোকের নাম মনে রাখতে পারবে ততই কাজের সুবিধা।

কারও সঙ্গে নতুন পরিচয় হলে তার নামটি ভাল করে শুনে নেবে। তার চেহারাটিও মনে করে নেবে।

আমি যখন খুব কম বয়সে প্রথম বিলেতে যাই তখন এক জনসংযোগ অফিসার আমাদের আটজনের সাংবাদিকের দলকে অনেক জায়গায় নিয়ে যেতেন। তিনি একবার আমাদের সঙ্গে কথা বলে সকলের নাম মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। অনেকে সংখ্যা একদম মনে রাখতে পারে না। আমি রাজনীতির অনেক লোককে দেখেছি পটাপট পরিসংখ্যান মুখস্থ বলে দিচ্ছেন। কত ধান চালের উৎপাদন। মাথাপিছু বিভিন্ন খাদ্যের ব্যবহার। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সব তাঁদের নখদর্পণে। এঁদের মধ্যে আমি বাংলাদেশের নেতা মৌলানা ভাসানিকে দেখে অবাক হয়ে যাই। তখন তাঁর আশি বছর বয়স। কিন্তু কী অসাধারণ স্মৃতিশক্তি। শিলচরে আমি ৮৬ বছরের এক বৃদ্ধাকে দেখেছিলাম। তিনি আমার ছাত্র সঞ্জয়ের ঠাকুমা। তিনি কবে কোথায় কী হয়েছে, কার সঙ্গে দেখা হয়েছে, কী কথা হয়েছে গড় গড় করে বলে দিয়েছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন এমন গড় গড় করে পরিসংখ্যান বলতেন। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ও আমি দেখেছি পটাপট পরিসংখ্যান বলে যাচ্ছেন। কোন সালে কী হয়েছিল গড় গড় করে বলে দিচ্ছেন। প্রণববাবু একবার আমায় বলেছিলেন, আমি এক সময় বাংলাদেশ সংসদের সদস্যদের নাম মুখস্থ বলে দিতে পারতাম। পোলিশ

ফুটবল ক্লাবের লিওপান্ড হেল্ড নামে একজন কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি বছরের পডর বছর ধরে খেলার কত স্কোর হয়েছে বলে মুখে মুখে দিতে পারতেন। একবার টিভিতে তাঁকে চারবছর আগের এক ম্যাচের বিবরণ জিজ্ঞাসা করা হল, তিনি গড় গড় দিলেন। ওই খেলায় পোল্যান্ড ৪-০ গোলে জিতেছিল। ১৮ আগস্ট ওই খেলা হয়। ২৭ হাজার দর্শক ছিল। ২৩৫ হাজার জেলাটি (পোলিশ মুদ্রা) টিকিট বিক্রি হয়।

বহু শিল্পী স্মৃতি থেকে ছবি আঁকতে পারেন। প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনের সবচেয়ে ভাল ছবি শিল্পী একেছিলেন তাঁকে অনেকদিন আগে একবার মাত্র দেখে।

কাউকে একবার দেখে মনে রাখা এটাও কিন্তু স্মৃতিশক্তি। দুর্বল স্মৃতির লোক কাউকে একবার দুবার দেখে চিনতে পারে না। লিনা পো নামে এক বিখ্যাত শিল্পী অন্ধ হয়ে যাবার পরও সুন্দর সুন্দর ভাস্কর্য করতেন শুধু স্মৃতি থেকে।

অসাধারণ ব্যক্তিদের কথা থাক। তুমি একজন সাধারণ ছাত্র। তোমার পড়ে কিছু মনে থাকে না। তুমি কী করবে? অনেকে এ অবস্থায় ভাবে আমার আর লেখাপড়া হবে না। মুখস্থ বিদ্যা কম থাকলে পরীক্ষা ভীতি আসে। এই ভীতি থেকে পরীক্ষার আগে অনেকের জ্বর আসে। মাথা ঘোরে। বুক ধরফড় করে। পেট খারাপ হয়। বমি পায়। এসবই কিন্তু মানসিক অসুখ। পরীক্ষা ভীতি থেকে এটা হয়, আর পরীক্ষাকে ভয় পাবে তখনই যখন মনে কিছু থাকে না। এই স্মৃতি কি বাড়ানো যায়? এতদিন বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল মস্তিষ্কে এক ধরনের রসক্ষরণের দরুন স্মৃতিধারণের ক্ষমতার তারতম্য ঘটে। কিন্তু এটা ঠিক নয়। আমাদের মস্তিষ্কের ভেতর কয়েক কোটি নার্ভ সেল বা কোষ আছে। এই নার্ভ সেলগুলির পরস্পরের মধ্যে সংযোগের ফলে আমরা মনে রাখতে পারি। এই সংযোগ ঠিকমত না হলে আর মনে থাকবে না।

প্রত্যেকটি বিষয় মনে রাখতে গেলে একটা প্রচণ্ড ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকা চাই।

সাধারণ লোকের ক্ষেত্রে দেখা যায় সব স্মৃতি কিছুক্ষণের জন্য ধরে রাখা যায়। তারপরেই মুছে যায়। ধরো একটা ফোন নম্বর—৩৭৫৫৬৭৪। এই নম্বরটা তুমি এইমাত্র জানলে। একবার শুনে নিয়ে তুমি স্মৃতি থেকে ডায়াল করলে। এনগেজড হল। দ্বিতীয়বার ডায়াল করতে গিয়ে দেখবে যে ৩৭৫৫৬

পর্যন্ত মনে আছে। বাকি দুটো নম্বর মনে পড়ছে না। পাঁচ মিনিট পর মনে করার চেষ্টা করো দেখবে গোটা নম্বর ভুলে গেছ। অনেকে যারা পড়া মনে রাখতে পারে না। পরীক্ষার পাঁচ মিনিট আগেও পড়ে নেয়। তারপর যদি মুখস্থ থেকে কিছু এল তো ভাল। নইলে ফেল। মুখস্থ উত্তর খাতায় লেখার পর বাড়ি এসে তারা কী লিখেছে আর মনে করতে পারে না।

প্রতিবছরের ইস্কুলের পড়া যদি বছরের শেষে ভুলে যাই তাহলে কোন জ্ঞানই তো হল না। অনেক কবিকে দেখেছি নিজের লেখা কবিতা একটাও মুখস্থ নেই। কত গায়ক গায়িকা খাতা দেখে গান করেন।

প্রত্যেক লোকের ক্ষেত্রে স্মৃতিশক্তি আলাদা আলাদাভাবে কাজ করে। এখন যাদের স্মৃতিশক্তি দ্রুত কাজ করতে চায় না তাদের সর্বপ্রথম মনোযোগ শিক্ষা করতে হবে। যাকে বলে মনঃসংযম।

এটা করতে হলে রোজ ভোরে নির্জন ঘরে বা মাঠে বসে ধ্যান অভ্যাস করতে হবে। ধ্যান মানে চুপচাপ চোখ বুজে বসে যে কোন একটি বিষয় চিন্তা। পাঁচটা চিন্তা তাড়িয়ে একটি চিন্তাই মাথায় রাখতে হবে।

দুনম্বর হচ্ছে পড়ার পর বিষয়টি বই বন্ধ করে লিখে ফেলতে হবে। তারপর মিলিয়ে দেখতে হবে কোথায় ভুল হচ্ছে।

তিন নম্বর আস্তে আস্তে পড়তে হবে। বই-এর পাশে পেন্সিল দিয়ে পয়েন্ট লিখতে হবে। বই-এর পাতাগুলির পুরো ছবিটা মনের ভেতর তুলে নিতে হবে। দরজা বন্ধ করে যা পড়েছ সে সম্পর্কে একটা ভাষণ দিতে চেষ্টা করো। ধরো তুমি ওই বিষয়টি কাল স্কুলে পড়াবে। ছাত্রদের কী বলবে কেমন করে বলবে সেটা প্র্যাকটিশ করো। সামনে একটা আয়না রাখো। রাতে ঘুমাবার আগে বিছানায় শুয়ে একবার ঝালিয়ে নাও আজ সারাদিন কী করলে। চেঁচিয়ে পড়লেই যে মনে থাকবে তা নয়। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই বিষয়টি নিয়েই ভাবতে হবে।

প্রতি প্যারাগ্রাফ পড়ার পর এক মিনিট থামতে হবে। ভাবো আগের প্যারার মানে বুঝতে পারলে কি না। না পারলে আবার পড়ো। কোন শ্লোক, শব্দার্থ, বিখ্যাত উক্তি, ফর্মুলা ফোন নম্বর মুখস্থ না হলে কাগজে লিখে দেওয়ালে সেঁটে দাও। রোজ দুবেলা কিছু সময় ওই লেখার দিকে তাকিয়ে থাকো। মনে মনে পড়তে থাকো। যদি তাতেও মুখস্থ না হয় তাহলে যে অংশটি মনে রাখা খুব দরকার সেটি কাগজে বা নোট বইতে লিখে পকেটে

রেখে দাও। যখন ট্রামে বাসে ট্রেনে যাবে বা স্টপে বাসের জন্য অপেক্ষা করবে তখন নোট বইটা টুক করে বার বার পড়ে নেবে। অনেকে এতে লজ্জা পায়। আরে লজ্জা পাবার কী আছে। তুমি তো চুরি করছো না।

ছোটবেলায় খুব ভাল মুখস্থ হয়। তাই যত বেশি করে পারো কবিতা মুখস্থ করে ফেলো। ইতিহাসের কতগুলি উল্লেখযোগ্য সাল তারিখ যে কোন ছাত্রেরই মনে রাখা দরকার। সেই সাল তারিখগুলি এই বই-এর পরিশিষ্টে দিলাম। সেই সঙ্গে দিলাম জীবনে চলার পথে কতগুলি বাণী। এগুলিও যেন মুখস্থ থাকে। মহাপুরুষদের উদ্ধৃতি বা কোটশন কিছু মুখস্থ রাখতে হবে। মনে রাখবে ছাত্রজীবনে যা মুখস্থ করবে সারাজীবন তা ভুলবে না।

আমাদের ছেলেমেয়েদের বড় হবার পথে বড় বাধা ইংরাজি। ইংরাজি বলতে ও লিখতে না জানলে কখনই নিজের এলাকা ছাড়িয়ে বাইরে যেতে পারবে না। হিন্দি দিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কাজ চালিয়ে নিতে পারো কিন্তু ইংরাজি না জানলে শিক্ষিত সমাজে কথাবার্তা বলতে পারবে না। বড় হয়ে কত দেশে ঘুরবে। কত নানা জাতির লোকের সঙ্গে কথা বলতে হবে। ইংরাজিতে কথা বলতে না শিখলে দেখবে নিজেকে খুব ছোট মনে হচ্ছে।

তুমি ইংলিশ মিডিয়মে পড়োনি। তাতে কী হয়েছে। ইংরাজিতে কথা বলা এখন থেকে প্র্যাকটিশ করো। তোমরা তিন চার বন্ধু মিলে একটা ক্লাব করো। ইংলিশ স্পিকিং ক্লাব। যখনই তোমরা একসঙ্গে মিলবে ইংরেজিতে কথা বলবে। প্রথম প্রথম দ্রুত কথা বলতে পারবে না তারপর দেখবে বেশ গড় গড় করে বলতে পারছ। বাংলা মাধ্যমের ছেলেমেয়েরা যাতে খুব সহজে নির্ভুল এবং ঝরঝরে ইংরাজি লিখতে পারে তার জন্য আমি বাংলাতেই একটি বই লিখছি। আমি গ্রামের ইস্কুল থেকে বাংলা মাধ্যম নিয়ে পড়েছি। বরাবর ইংরেজিকে ভয় করে এসেছি। পরে বুঝেছি ইংরেজিকে ভয় পেলে ঘর কুনো হয়ে বসে থাকতে হবে।

বড় হতে গেলে যত ভাষা শিখবে ততই তোমার জোর বাড়বে। মাতৃভাষা খুব ভাল শিখতে হবে। ভাল শেখা কাকে বলে জানো? যেমন ধরো বঙ্গিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ সব লেখা পড়ে বুঝতে পারা। ইংরেজি প্রতি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ বলতে পারা। ঠিকঠাক বানান লেখা। আমি বিএ পাস করা ছেলেমেয়েরা যখন ভুলভাল ইংরেজি লেখে তখন কিছু মনে করি না কিন্তু যখন বাংলা বানান ভুল লেখে তখন খুব রেগে যাই।

সত্যিকারের বড় হতে গেলে সত্যিকারের শিক্ষিত হতে হয়। আমি বিএ এমএ পাসের খুব দাম দিই না। প্রকৃত শিক্ষা কী?

১. সারা দুনিয়ায় এই মুহূর্তে কোথায় কি ঘটেছে তার মোটামুটি খরব রাখা। এর জন্য নিয়মিত খবরের কাগজ পড়তে হয়। ম্যাগাজিন পড়তে হয়। টিভি দেখতে হয়। সারা দুনিয়া সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকাই প্রকৃত শিক্ষা।

২. অতীতে মানুষ কী ছিল, কী ভাবে তার বিবর্তন হল। মানুষের সভ্যতা ও সমাজ পরিবর্তনের পথে কোন কোন আবিষ্কার তাকে সাহায্য করল এর বিবরণ জানা দরকার। এই জানাটা প্রকৃত শিক্ষা।

৩. ইতিহাস সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা থাকতে হবে।

ইতিহাসকে অনেক ছেলেমেয়ে ভয় পায়। আবার দেখবে অনেক লেখাপড়া জানা লোক ইতিহাস গুলিয়ে ফেলেছে। ইতিহাসকে চটপট মনে রাখার জন্য একটা ছোট্ট ক্যাপসুল তৈরি করো। এটা মনে রাখলে ভারতের ইতিহাস তোমাদের সারাজীবন মনে রাখবে। প্রথমে ইতিহাসকে BC ও AD এই দুভাবে ভাগ করো। BC অর্থাৎ যিশু খ্রিস্টের জন্মের আগে কী কী ঘটেছে দ্যাখো।

খ্রিস্ট পূর্বাব্দ। যিশুর জন্মের তিন হাজার বছর আগে অর্থাৎ এখন থেকে ছয় হাজার বছর আগে পাঞ্জাব ও সিন্ধু ও গুজরাতে ছিল সিন্ধুবিধৌত সভ্যতা।

তারপর যিশু জন্মের দু থেকে দেড় হাজার বছরের মধ্যে এল আর্যরা। ওই সময় বেদ রচনা হল।

ভগবান বুদ্ধ জন্মালেন ৫৬৩ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে ৪৮৭ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন।

এরপর ইতিহাসে বড় ঘটনা মগধ বংশ প্রতিষ্ঠা। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিম্বিসার। (৫৪৭-৪৯৫ BC) মগধ বংশকে উচ্ছেদ করে রাজা হল নন্দরা। নন্দবংশ ধ্বংস করে চন্দ্রগুপ্ত ৩২২ BC মৌর্য বংশের পত্তন করেন। তার কিছু আগে ঘটে যায় আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ। (৩২৭ BC) মৌর্যবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা অশোক (২৭৩-২৩৬ BC)। এরপর খ্রীস্ট পূর্বাব্দের আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা নেই। অশোকের মৃত্যুর পর মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন হয়। রাজত্ব করে শুঙ্গ বংশ, কন্ব বংশ, সাতবাহন বংশ। এরা ছোট ছোট অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত ছিল।

প্রথম শতাব্দী : এই শতাব্দীতে রাজত্ব করে গ্রিক, শক, পার্থিয়ান ও

কুষাণরা। প্রথম শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ রাজা কুষাণরাজ কনিষ্ক।

চতুর্থ শতাব্দী : দুশো বছর তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা নেই। চতুর্থ শতাব্দীতে আসেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। রাজত্বকাল (৩৮০-৪১২)

এরপরে ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা দ্বাদশ শতাব্দীতে ১১৯২ সালে তরাইনের যুদ্ধে পৃথ্বীরাজকে হারিয়ে মহম্মদ ঘোরী দিল্লির সিংহাসন দখন করেন। শুরু হয় সুলতানি আমল। ত্রয়োদশ শতক থেকেই ভারতে পাকাপাকিভাবে মুসলিম শাসন শুরু হয়।

১৩ শতাব্দী : কুতবউদ্দিন আইবক, ইলতুৎমিস, গিয়াসুদ্দিন বলবন, আলাউদ্দিন খিলজি।

১৪ শতাব্দী : গিয়াসুদ্দিন তুঘলক, মহম্মদ বিন তুঘলক, ফিরোজশাহ তুঘলক।

১৫ শতাব্দী : সিকান্দার লোদী, ইব্রাহিম লোদি, কবীর, রামানন্দ, গুরুনানক, চৈতন্য ও শঙ্করদেবের জন্ম। ভাস্কো ডা গামার কালিকট আগমন (১৪৯৮)।

১৬ শতাব্দী : ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীর পরাজয় ও বাবরের মুগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা। নানক, কবীর দাদু, চৈতন্য শঙ্করদেবের, বল্লভাচার্য সুরদাস, মীরা বাঈ, এই সময়ই তাঁদের ভক্তিধর্ম প্রচার করেন। তুলসীদাস লেখেন হিন্দি রামায়ণ। এই শতাব্দীর মোগল সম্রাটরা হলেন বাবর, হুমায়ুন, আকবর। উল্লেখযোগ্য ঘটনা পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ (১৫৫৬)। শের সাহেব স্বল্পকালের জন্য দিল্লির ক্ষমতা দখল।

সপ্তদশ শতাব্দী : জাহাঙ্গীর, শাহজান ও ঔরংজীবের রাজত্বকাল। শিবাজীর অভ্যুত্থান (১৬২৭-১৬৮০)। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সনদ লাভ। কুঠি প্রতিষ্ঠা।

অষ্টাদশ শতাব্দী : ঔরংজীবের মৃত্যু (১৭০৭)। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যাপক বাণিজ্যের অধিকার লাভ। পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭)। ভারতের স্বাধীনতা অস্তাচলে।

ঊনবিংশ শতাব্দী : বাংলার নবজাগরণ। সিপাহী বিদ্রোহ। (১৮৫৭) বাংলায় নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯-৬০)। ওয়াহবি আন্দোলন। শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহের মৃত্যু (১৮৬২) জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা (১৮৮৫)।

বিশ শতাব্দী : প্রথম মহাযুদ্ধ (১৪১৪-১৪১৮) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (১৯৩৯-

১৯৪৫)। ভারতের স্বাধীনতা ১৯৪৭।

ইতিহাস ছাড়া সাহিত্য সম্পর্কেও একটা ধারণা থাকা দরকার। বাংলা ও ইংরাজি সাহিত্যে ছোটদের জন্য অনেক ভালভাল বই আছে। ইস্কুলে বা পাড়ার লাইব্রেরিতে খোঁজ করলেই এইসব বই পাবে। আজকাল সব শহরেই বইমেলা হচ্ছে। তোমরা অতি অবশ্য বইমেলায় যাবে, বছরে অন্তত দু-তিন খানা বই কিনতেই হবে। নইলে বই-এর প্রতি আকর্ষণ জন্মাবে না।❑

।। নয় ।।

স্মার্ট বয় : স্মার্ট গার্ল

টিভিতে একটা বিজ্ঞাপন দেখেছ? একটি পানীয় খেয়ে ভাইবোন দুজনে বলছে আই অ্যাম এ স্মার্ট বয়। আই অ্যাম এ স্মার্ট গার্ল।

ইংরাজিতে Smart এই শব্দের যথার্থ কোন বাংলা প্রতিশব্দ নেই। স্মার্ট মানে ঝকঝকে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। চোখে-মুখে, পোশাকে, কথায় বুদ্ধির ছাপ।

বাংলায় একে বলব—চৌকশ, বুদ্ধিদৃপ্ত, চালাক-চতুর।

স্মার্টদের সবাই ভালবাসে। এর ওপর পড়াশোনায় ভাল হলে ও বিনয়ী হলে তো কথাই নেই। অনেকে ভাবে বিনয়ী হলে বুঝি লোকে বোকা বলবে। যেমন সরল মানুষদের লোকে বোকা ভাবে। কিন্তু স্মার্টনেশ বা বুদ্ধি মানে দুষ্টবুদ্ধি নয়। বুদ্ধিমানের বুদ্ধি। অনেকে বোকা চালাক হয়। তারা অকারণে স্মার্ট হবার ভাব করে। এদের বলে ওভার স্মার্ট বা পাকামি। ছোটদের সঙ্গে ছোটদের মতই ব্যবহার করতে হয়।

স্মার্ট হতে গেলে তোমাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বা ফিটফাট থাকতে হবে। দামী পোশাক যে পরতে হবে তার কোন মানে নেই। বরং সাধাসিদে পোশাকেই স্মার্টনেশ বেশি খোলে। জামা যদি প্যান্টের ভেতর খুঁজে পরো, জুতোর সঙ্গে যদি মোজা পরো, যদি চুল আঁচড়ানো থাকে, মুখে প্রসন্ন ভাব থাকে তাহলেই তুমি স্মার্ট হয়ে গেলে। স্মার্টনেশের লক্ষণ ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা। ইংরেজিতে একে বলে পার্সোনাল হাইজিন। যেমন নিয়মিত দাঁত মাজা। নখের ময়লা পরিষ্কার রাখা, রোজ সাবান মেখে স্নান করা, দুবেলা স্নানের অভ্যাস গরম কালের পক্ষে খুবই ভাল। জুতো পরে বেরুলে কালি দিয়ে বেরুবে।

ঝকঝকে ছেলের প্রতিটি বই মলাট দেওয়া থাকবে। ইস্কুলে যাবার আগে সে পেন্সিল কেটে নিয়ে যাবে। দেখে যাবে ইস্কুলের রাফ খাতায় যথেষ্ট শাদা পাতা আছে কি না। সে একটি নিজস্ব ডায়েরি রাখবে। তাতে বন্ধু-বান্ধবদের

ঠিকানা, নতুন বই-এর নাম। মহাপুরুষদের বাণী ও নিজের মনের ইচ্ছার কথা লেখা থাকবে। মাঝে মাঝেই লিখবে আমি বড় হতে চাই। কিন্তু বড় হবার পথে আমার এই এই বাধা। এই বাধাগুলিকে আমি দূর করবো। অপরিচিত বয়স্ক পুরুষদের কাকু বা জেঠু বলে ডাকবে। মহিলাদের বলবে মাসিমা কাকিমা বা জেঠিমা। ওপরের ক্লাসের ছেলেমেয়েদের দাদা বা দিদি বলে ডাকবে। খুব অন্তরঙ্গ হয়ে গেলে নাম ধরে ডাকতে পারো।

কাকু বা জেঠু, মাসিমা ও কাকিমা শব্দ কথার মধ্যে বার বার বললে তাঁরা তোমার ওপর খুশি হবেন। যেমন—

মাসিমা আমাকে চিনতে পারছেন? আমি বাচ্চু (প্রণাম)

ও বাচ্চু, থাক থাক বাবা। কত বড় হয়ে গিয়েছিস। এখন কী পড়ছিস?

এইবার মাধ্যমিক দেব মাসিমা।

মাধ্যমিক? এই বছরে? বলিস কী। আমার তো ধারণা তুই ক্লাস সেভেন এইটে পড়িস। তোর বাবা মার খবর কী?

বাবাতো এখন দিল্লি থাকেন মাসিমা। আমি মা ও আমার বোন এখন বাড়িতে থাকি।

তোর বোনের কোন ক্লাস হল?

ক্লাস সিক্স। ও খুব ভাল গান গায় মাসিমা। অনেক প্রাইজ পেয়েছে। তাই নাকি। ওকে নিয়ে আসিস একদিন, গান শুনব।

যাই মাসিমা।

যা বাবা। বেঁচে থেকো। বড় হও। এই প্রার্থনা করি।

পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করলে মনও ভাল থাকে। পরিবেশের যথেষ্ট প্রভাব আছে। মনের ওপর। পরিচ্ছন্নতা মানে বাবুগিরি নয়। বাবুগিরি হচ্ছে বাড়াবাড়ি। ছোটদের দামী পোশাক-আসাক পরা উচিত নয়। একটু কৃচ্ছ্র সাধন শেখা উচিত। হেঁটে ইস্কুলে যেতে পারলে সবচেয়ে ভাল। এতে ব্যায়াম হয়। আত্মবিশ্বাস বাড়ে। ধনীর আদরের দুলালদের দিয়ে সমাজের কোন উপকার হয় না। ধনীদের উচিত তাদের ছেলেমেয়ের হোস্টেলে রেখে পড়ানো। স্কুলের ছেলেদের বড় বড় চুল রাখা বাহুল্য। ছোট চুল থাকলে চুলের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে।

ছেলে এবং মেয়ে দুজনের জীবনযাত্রার মধ্যে কোন বড় ফারাক না থেকে যায়। ভাইবোন এক সঙ্গে মানুষ হল দুজনে একই ভাবে মানুষ হবে।

পরিবারের প্রতি দুজনেরই সমান দায়িত্ব। দুজনকেই বাড়ির কাজ করতে হবে। বাবা-মাকে সাহায্য করতে হবে। মেয়েরা ঘরকন্নার কাজে সাহায্য করবে। তেমনি ছেলেরা ফুলের গাছ করবে। বাড়ির ঝুল ঝাড়বে। বাজার করে আনবে। রেশনে যাবে। দুধ আনবে। বাইরের কাজ মেয়েরাও করতে পারে। তবে কাজ ভাগাভাগি করে নেওয়া ভাল। বাড়ির কাজ না করে শুধু বই পড়ে আর টিভি দেখে যে সব ছেলেমেয়ে দিন কাটায় তারা কখনও বড় হতে পারবে না। বড় হতে গেলে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। আর কঠোর পরিশ্রম এক ধরনের অভ্যাস। ছোটবেলা থেকে শিখতে হয়। পরিচ্ছন্নতা ফিটফাট থাকার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ মনে রাখতে বলি।

স্বামী বিবেকানন্দ তখন লন্ডনে। সেটি ১৮৯৬ সাল। আমেরিকা থেকে ইংলন্ডে এসেছেন স্বামীজী। এক বিদেশি ভক্তের বাড়িতে রয়েছেন। স্বামীজী সন্ন্যাসী। পরনে গেরুয়া পোশাক। মাথায় গেরুয়া পাগড়ি। কিন্তু খুব ফিটফাট। পোশাকে কোথাও ময়লা লেগে নেই।

ওই বাড়িতে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন মহেন্দ্রনাথ দত্ত। মহেন্দ্র স্বামীজীর ছোট ভাই।

একদিন স্বামীজী মহেন্দ্রনাথকে বললেন মহেন্দ্র, সব সময় আঙুলগুলি পরিষ্কার করে রাখবে। নখে যেন ময়লা না থাকে। বড় নখ হলে কেটে ফেলবে। এই বলে জামার পকেট থেকে একটি লোহার নখ কাটার যন্ত্র বার করলেন স্বামীজী। বললেন, দ্যাখো আমার পকেটে সব সময় নখ কাটার ও নখ ঘষার যন্ত্র থাকে।

মহেন্দ্র তো দেখে অবাক। সন্ন্যাসী পকেট থেকে রুদ্রাক্ষ কিংবা ফুল বার করছেন না, জপের মালা বার করছেন না। বার করছেন কিনা নখ কাটার যন্ত্র।

হ্যাঁ স্বামী বিবেকানন্দ মনে করতেন পরিষ্কার না থাকলে মন কখনও প্রফুল্ল থাকে না। এজন্য সব সময় ফিটফাট থাকতে হবে।

একদিন স্বামীজী মহেন্দ্রনাথকে দেখে বললেন, কী রে কী খেয়েছিস?

মহেন্দ্র বললেন, অনেকদিন ভাত খেতে ইচ্ছে হয়েছিল। তাই ভাত আর একটু মাংসের ঝোল খেয়েছি। স্বামীজী বললেন, মাথার চুল সব সময় বুরুশ করে রাখবে, চুল যেন উসকো-খুশকো না হয়। তাহলে এ দেশের লোক বড় ঘৃণা করে। জামা ইজের সর্বদা বুরুশ করতে হয়। সর্বদা ফিটফাট থাকবে নইলে লোকে ঘৃণা করবে।

একে তো ভারতীয় বলে লোকে অবজ্ঞা করে, তার ওপর যদি ফিটফাট হয়ে না থাকতে পারো তাহলে লোকে আরও ঘৃণা করবে। স্বামীজী মহেন্দ্রকে বললেন, স্নান করেছিস? মহেন্দ্র উত্তর দিল, কি করে নাইব, আমার বাড়িতে কল চৌবাচ্চা নেই।

স্বামীজী বললেন, এ দেশে অমন করে স্নান করে না। ঘরেতে ব্যথ টবেতে গরম জল মিশিয়ে দিয়ে যাবে। আগে একখানা স্পঞ্জ ভিজিয়ে গায়ে বুলিয়ে নিতে হয়। তারপর সাবান দিয়ে গাটা ঘষে নিতে হয়।

দ্বিতীয়বার ভিজে স্পঞ্জ দিয়ে সাবানের ফেনাটা গা থেকে তুলে ফেলতে হয়। তারপর ব্যথ টবে বসে মগে করে মাথায় জল দিয়ে গা-টা ধুয়ে ফেলে শুকনো তোয়ালে দিয়ে গাটা পুঁছে ফেলার পর জামা কাপড় পরতে হয়। নইলে বুকে ঠাণ্ডা লেগে যাবে। আর দ্যাখ নাকের শিকনি হাত দিয়ে অমন করে

ফেলতে নেই। দুখানা রুমাল পকেটে রাখতে হয়, নাক ঝাড়তে হলে রুমাল দিয়ে নাক মুছে পকেটে রাখতে হয়। শিকনি থুথু যেখানে সেখানে ফেলতে নেই; এর ফলে তাতে অপরের ব্যামো হবে। আর খেয়ে দেয়ে খুব ফাঁকা হাওয়ায় বেড়ানো দরকার।

তারপর স্বামীজী আবার বললেন,

রোজ একঘেয়ে খেলে অরুচি হয়। বাড়ির মেয়েটিকে বলিস যে মাঝে মাঝে যেন সে অমলেট করে দেয় তাহলে মুখ বদলানো হবে।

একজন সন্ন্যাসী হয়েও স্বামীজী মনে করতেন সংসারে থাকতে গেলে হেসে খেলে কাটাতে হবে। পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যে কোন মালিন্য আনলে চলবে না। স্বামীজী নিজেও জমকালো পোশাক পরতেন। পাইপ খেতেন।

স্বামীজী আমেরিকায় গিয়ে আমেরিকানদের ভাল জিনিসটা গ্রহণ করতে বলেছেন। যেমন তিনি বলতেন আমেরিকা দেশটা বিদ্যুতে ভর্তি। সকলের মধ্যে উদ্যম আর উৎসাহ। গরিব ইটালিয়ানরা আর রাশিয়ানরা পুঁটলি ঘাড়ে করে এ দেশে ঢুকল। মানুষ দেখলে ভয় পায়, পায়ে জড়িয়ে যায় ময়লা কাপড়গুলো।

মাস দুতিন বাদে দেখি যে বেশ ভাল কাপড় পরেছে। বুক ফুলিয়ে গটমট করে যাচ্ছে। রেস্তোরাঁয় ঢুকছে ও সকলের সঙ্গে খাচ্ছে। আর কোন ভয় ভাবনা নেই। দেশটা স্বাধীন কিনা। তাই ওদের মধ্যেও স্বাধীনতা ঢুকে গেছে। কি কর্মের ইচ্ছা। কেউ কারও ওপর নির্ভর করে না। ছেলে বাপের ওপর বা বাপ ছেলের ওপর নির্ভর করে থাকতে চায় না। যে যার স্বতন্ত্র হয়ে অর্থ রোজগার করতে চায় এবং নিজেও স্বাধীন থাকতে চায়। স্বাধীনতা যে কি জিনিস যে আমেরিকায় গেলে বোঝা যায়। আমেরিকায় দেখলুম, কি বড়, কি ছোট সকলেই কাজ করতে মহা উৎসাহী এবং সকলেই আশা করে থাকে যে সে ভবিষ্যতে ক্রোড়পতি হবে এবং এমনকি প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত হবে। কর্ম, আত্মবিশ্বাস-প্রতিবন্ধক তা চূর্ণ বিচূর্ণ করা-স্বাধীনতা প্রকাশ করা—এ যেন আমেরিকার হাওয়াতে বইছে।

স্বামীজী চেয়েছিলেন আমেরিকান ও ইংরেজদের মত আমাদের দেশের মানুষ এমন ফিটফাট, চালাক চতুর ও কর্মঠ স্বাধীনতা প্রিয় হোক। তা না হলে এ দেশের উন্নতি নেই। স্বামীজী তাই দেশের তরুণদের চরিত্র গঠন করতে বলেছিলেন। তাঁর ছোটখাটো উপদেশ থেকেও অনেক বড় সন্ধান পাওয়া

যায়। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বোধ থেকেই সামাজিক পরিচ্ছন্নতাবোধ আসে। আমি কলকাতায় সল্ট লেকে থাকি। এখানে স-সবাই শিক্ষিত ও সম্পন্ন ব্যক্তি। কিন্তু আমার পাশের খালি প্লটে প্রতিবেশিরা জঞ্জাল ফেলে পরিবেশ বিষাক্ত করে তুলেছে। বিলেত আমেরিকায় হলে এটা হতে পারত? সেদেশে পরিচ্ছন্নতার ওপর সবচেয়ে জোর দেওয়া হয়।

অপরিচ্ছন্ন কোন জাত বড় হতে পারে না। কোন ব্যক্তিও বড় হতে পারে না। আমাদের দেশ যে বড় হচ্ছে না এটাও তার একটা কারণ।

খ্রিষ্টান পাড়া বা তাদের চার্চে গিয়ে দ্যাখো কী সুন্দর ফিটফাট রেখে দিয়েছে। আর আমাদের মন্দির মসজিদ বস্তিগুলো পাশাপাশি দ্যাখো। পরিচ্ছন্নতাকে আমরা মূল্য দিই না। আমাদের সন্ন্যাসীরা তো নোংরার জীবন্ত প্রতিমূর্তি।

স্বামী বিবেকানন্দ জাতিতে গড়তে চেয়েছিলেন। শুধু নিজে বড় হতে চাননি। সবাইকে বড় করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁর কথা শুনিনি। সেজন্য অনেকে ধনী হয়েছি। মানুষ হতে পারিনি।❑

।। দশ ।।

যখন বাড়িতে

তোমার বাবা যদি খুব গরিব হন অথবা বড় কোন চাকরি না করেন, তাহলেও তোমার অগৌরবের কোন কারণ নেই। বৃহত্তর পৃথিবীতে কেউ কারও বাবার নামে পরিচিত হয় না। নিজের নামে পরিচিত হয়। তুমি নিজে কতখানি কী করতে পেরেছ সেটাই তোমার পরিচয়।

আব্রাহাম লিঙ্কনের বাবা এক গরিব চাষী ছিলেন। বিদ্যাসাগরে বাবা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় খাওয়া জুটত না। তিনি দুটাকা মাসিক বেতনের একটি চাকরি যোগাড় করেছিলেন।

ঠাকুরদাস কলকাতায় এসে দেখলেন ইংরাজি না জানলে ভাল চাকরি পাওয়া যাবে না। তিনি ইংরেজি শিখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তখন তিনি বয়স্ক। ওই বয়সে আর স্কুলে ভর্তি হওয়া যায় না। এক ভদ্রলোকের সন্ধান পাওয়া গেল। তিনি ঠাকুরদাসকে বললেন, রোজ সন্ধ্যার পর তাঁর বাড়ি এসে পড়ে যেতে।

ঠাকুরদাস একজনের বাড়িতে থাকতেন। সে বাড়িতে সন্ধ্যার পরই রাতের খাওয়া দাওয়া শুরু হয়ে যেত। ঠাকুরদাস যখন পড়ে অনেক রাতে বাড়ি ফিরতেন, তখন খাওয়ার পাট চুকে গেছে। ঠাকুরদাসের আর রাত্তির বেলা খাওয়াই হত না। দিনের পর দিন একবেলা খেয়ে ঠাকুরদাস রোগা হয়ে যেতে লাগলেন।

ঠাকুরদাসের দুর্দশা দেখে আর এক ভদ্রলোক তাঁকে তাঁর বাড়িতে আশ্রয় দিলেন। আগেকার দিনে ব্রাহ্মণেরা শূদ্রদের হাতে খেতেন না। শূদ্রদের বাড়ি থাকলে নিজেরা রান্না করে খেতেন। ঠাকুরদাস নিজে রান্না করে খেতে লাগলেন।

ঠাকুরদাসের নিজের কোনও আয় ছিল না। তাঁর আশ্রয়দাতা তাঁর খাওয়ার যোগাড় করে দিতেন। কিন্তু ভাগ্য বিপর্যয়ের ফলে তাঁর আশ্রয়দাতা আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। অনেকদিন তাঁর ঘরে খাবার যোগাড় থাকত

না। ফলে ঠাকুরদাসকেও মাঝে মাঝে অনাহারে কাটাতে হত।

ঠাকুরদাসের নিজের সম্বল বলতে ছিল মাত্র একটি পিতলের থালা আর ছোট ঘটি। থালাখানিতে ভাত ও ঘটিতে করে জল খেতেন। অর্থাভাবে তিনি থালাটা বেচে দিতে গেলেন। কিন্তু কাঁসারি থালা কিনতে রাজি হল না।

একদিন দুপুরে ঠাকুরদাসের খাওয়া হয়নি। তিনি অন্যমনষ্ক হয়ে ক্ষুধার যন্ত্রণা ভুলবার জন্য পথে পথে ঘুরতে লাগলেন।

একদিন ঠাকুরদাস অমনি না খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। প্রচণ্ড জলতেষ্টা পাওয়ায় তিনি একটি দোকানে গিয়ে জল চাইলেন। দোকানের মালিক এক মহিলা। মহিলা ঠাকুরদাসের শুকনো মুখ দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, দাদাঠাকুর, মনে হচ্ছে আপনি আজ সারাদিন কিছু খাননি।

ঠাকুরদাস বললেন, হ্যাঁ মা।

আপনি একটু বিশ্রাম করুন। আমি আসছি। এই বলে মহিলা উঠে গিয়ে দই কিনে আনলেন। তারপর ঠাকুরদাসকে খুব তৃপ্তি করে দই চিঁড়ে খাওয়ালেন। যাবার সময় বলে গেলেন আপনি ক্ষুধা পেলেই আমার কাছে চলে আসবেন।

ঠাকুরদাস এরপর থেকে প্রায়ই ক্ষুধা পেলে মহিলার দোকানে গিয়ে খেয়ে আসতেন। একদিন বললেন, আপনি আমায় একটি চাকরি যোগাড় করে দিন। যখন মা আর নাবালক ভাই বোনের কথা স্মরণ হয় আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করে না। ওই ভদ্রমহিলার চেষ্টায় ঠাকুরদাস দুটাকা বেতনের চাকরিটা পান। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হয়েছিলেন। প্রকাশনা থেকে তিনি অনেক অর্থ উপার্জন করেছেন। তিনি পাণ্ডিত্যে, বদান্যতায়, চরিত্রশক্তিতে বাঙালির ইতিহাসে এক অগ্রণী পুরুষ। কিন্তু তাঁর বাবা যে দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। এক সময় খেতে পেতেন না তার জন্য কি ছেলের বিদ্যাসাগর হওয়া আটকেছিল? আর বিদ্যাসাগর কি এজন্য বাবাকে কখনও অসম্মান করেছেন? বরং বাবার মৃত্যুর পর তিনি শিশুর মত হাউ মাউ করে কেঁদেছিলেন।

তোমাদের মধ্যে যারা শৈশবে বাবা কিংবা মাকে হারিয়েছ তারা বুঝতে পারো। বাবা-মা এর অভাব কতখানি। যদিও এই অভাবের ফলে ছেলেমেয়ের বড় হওয়া আটকায় না, কিন্তু এটা একটা বেদনা। এটা একটা অভাব, তাই তোমাদের যাদের বাবা-মা আছেন তাঁরা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করো। বাবা-মাকে ভালবাসো। কারণ তারা তোমাদের কাছ থেকে এই ভালবাসা ছাড়া আর কিছুই চান না।

এইজন্য আমাদের শাস্ত্রে বলেছে, মর্ত্যে মা সবচেয়ে বড়। বাবা স্বর্গের চেয়ে উঁচু। মা এবং জন্মভূমি স্বর্গের চেয়ে বড়।

জননী-জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সি। আমি আগেই বলেছি অনেক বড় মাপের মানুষ বাবা মায়ের মনে কষ্ট হবে বলে নিজের সুখ উন্নতি ত্যাগ করেছেন। শুধু বৃহত্তর স্বার্থে অর্থাৎ বহু মানুষের কল্যাণের কথা মনে করে বুদ্ধদেব স্ত্রী-পুত্র-পিতামাতাকে ত্যাগ করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মাকে কাঁদিয়ে গৃহত্যাগ করেছিলেন। বিপ্লবীরা মাকে কাঁদিয়ে ফাঁসিয়ে মঞ্চে গিয়েছিল। কিন্তু সে সব দেশ ও দশের জন্য। কিন্তু তোমার ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য কখনই বাবা-মায়ের অমতে কাজ করবে না। তাঁদের আশীর্বাদ ছাড়া কোন কাজ সিদ্ধ হয় না।

বাড়িতে প্রথম সংঘাত বাধে কথা শোনা নিয়ে। ছেলেমেয়েদের মধ্যে

নিজেদের মত চলার একটা প্রবণতা দেখা দেয়।

মা হয়তো বললেন—এখন আড্ডা না দিয়ে পড়তে বোস। অথবা এখন টিভি দেখো না। অথবা এখন খেয়ে নিয়ে তবে বেরোও। তুমি শুনলে না। এইভাবে প্রতিপদে পদে বাবা-মা চান সন্তানকে একটা শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে।

আমার কাছে অনেক বাবা-মা অবাধ্য ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসেন। একবার এক ভদ্রলোক তাঁর ছেলেকে নিয়ে এলেন। ছেলেটি পড়াশোনায় অমনোযোগী। আমি তাকে প্রশ্ন করে জানলাম। তার ধারণা হয়েছে যে বোম্বে গেলে ফিল্মের হিরো হতে পারবে। কিন্তু তার চেহারা হিরো হবার মত নয়। এই ছেলেটি একটি বিভ্রান্তিতে ভুগছে। এটি এক ধরনের মনোরোগ।

তীব্র অবাধ্যতা এক ধরনের মানসিক অসুখ। যখন কোন ছেলেমেয়ের আর পড়তে ভাল লাগে না, পরীক্ষায় ভীতি আসে, মন সর্বদা উড়ু উড়ু করে তখন বুঝতে হবে কোন কারণে সে মনের অসুখে ভুগছে। তাকে অবিলম্বে মনোরোগের পরামর্শ কেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে।

তোমাদের মনে রাখতে হবে ছাত্রজীবনে যদি তোমরা শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে না চলো। তাহলে পরবর্তীকালে তোমরা মুশকিলে পড়বে। যদি নিতান্তই পড়াশোনায় মন বা বুদ্ধি না থাকে তাহলে সময় নষ্ট না করে হাতের কাজ শিখে নাও। নয়তো বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোন বড় শহরে ভাগ্যান্বেষণে চলে যাও। ব্যবসা করে বড় হও। এতে বুদ্ধি আর কঠোর পরিশ্রম লাগে। মুম্বইতে ৩৫ হাজারের মত বাঙালি স্বর্ণকার আছে। এদের মধ্যে অনেকে কোটিপতি। তারা অনেকে স্কুলের পড়া শেষ না করে মুম্বাই চলে গিয়েছিল। তারপর হাতের কাজ শিখে পরিশ্রম করে বড় হয়েছে।

তুমি কি ফুটপাথে রাতে শুয়ে দিন কাটাতে পারবে?

তুমি কি ঠেলাগাড়ি চালাতে পারবে?

আমি আন্দামানের এক প্রাক্তন সাংসদকে জানি, যিনি কিশোরকালে কলকাতায় ঠেলাগাড়ি চালাতেন।

তুমি কি বয় হিসাবে জীবিকা শুরু করতে পারবে?

অর্থ উপার্জনের বহু পথ আছে। কিন্তু শুধু উপার্জন করে বড়লোক হয়ে লাভ কী? হাজার হাজার বড় লোক বিলাস ব্যসনে টাকা ওড়াচ্ছে। তাতে দেশের কী উপকার? ❑

।। এগার ।।

কেমন করে কথা বলবে?

ক্লাস সেভেনে উঠে গেলেই বুঝতে হবে বেশ বড় হয়ে গিয়েছ। তখন নিজের জামা-প্যান্ট নিজে কেচে শুকোতে দেবে। নিজের বিছানা নিজের পেতে নেবে। ক্লাস নাইনে ওঠার পর মেয়েদের হাতের কাজও শিখে নিতে হবে। যেমন উল বোনা। এমব্রয়ডারির কাজ। টুকটাক রান্নাবান্না। বাড়িতে অতিথি এলে আপ্যায়ন করা। বাড়িতে অতিথি এলে চাকর-বাকর দিয়ে চা জলখাবার না পাঠিয়ে ছেলেমেয়েরা যদি নিজের হাতে এনে প্লেট সাজিয়ে দেয় তাহলে অতিথি খুব সন্তুষ্ট হন। ছেলেমেয়েদেরও আত্মবিশ্বাস বাড়ে। বড় হলে যে মানুষ যত সামাজিক তার তত সুনাম। একে বলে জনসংযোগ। ছোটবেলা থেকে অপরিচিতদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। কীভাবে কথা বলতে হয় সেটাও শেখার।

ধরো তোমার বাবার পরিচিত এক ভদ্রলোক ফোন করেছেন। তুমি টেলিফোনটা ধরলে। তিনি বললেন—হ্যালো, রথীনবাবু আছেন?

তুমি বললে—বাবা তো বাড়ি নেই। আপনি কে বলছেন?

আমি নির্মলবাবু বলছি।

নমস্কার আঙ্কল অথবা জেঠু বা কাকাবাবু। অথবা মাসিমা বা কাকিমা।

তারপর বলবে—বাবাকে কিছু বলতে হবে?

বোল যে আমি ফোন করেছিলাম।

বোলব। আপনি ভাল আছেন?

হ্যাঁ বাবা। তুমি ভাল। কোন ক্লাসে পড়ছ এখন?

এবার আমার ক্লাস সেভেন হল।

বেশ। বেশ। আচ্ছা রাখছি কেমন?

অথবা কোন অপরিচিত লোক তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে এল। বেল বাজাতে দরজা না খুলে (তোমার ওপর নির্দেশ আছে বাইরের কেউ এলে দরজা খুলবে না, তুমি দরজার এপার থেকেই বলবে—বাড়ি তো তো কেউ

নেই। কিছু বলতে হবে?

বলবে যে আলাউদ্দিন সাহেব এসেছিলেন।

আমি বলে দেব। আপনি রবিবার সকালের দিকে যদি আসেন। তাহলে বাবা তখন থাকবেন, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।

আচ্ছা ঠিক আছে।

ধন্যবাদ।

আমি দেখেছি অনেকেই টেলিফোনে আলাপের রীতিনীতি জানে না। অনেক লোক আছেন। সামনাসামনি ভদ্র, কিন্তু টেলিফোন ধরলেই মারমুখী হয়ে কথা বলেন। অথবা হ্যালো কথাটা বলেন বিরক্তির সঙ্গে। তখন তাঁর সঙ্গে আর কথা বলতে ইচ্ছা করে না।

টেলিফোন রিসিভ করে যখন হ্যালো বলতে তখন খুব ভদ্রভাবে বলবে। পরিচিত কেউ হলে বেশ আন্তরিকতার সঙ্গে বলবে—কে রেখা? হ্যাঁ বল বল। কোথা থেকে বলছিস? কেমন আছিস?

মাস্টারমশাই ফোন করলে বলবে বলুন স্যর। কথার শেষে স্যর বলবে। সবশেষে বলবে প্রণাম নেবেন স্যর।

অনেকের উচ্চারণের জড়তা থেকে যায়। এটি স্মার্টনেসের পথে বিরাট বাধা। সেজন্য প্রত্যেকটি শব্দের উচ্চারণের উপর জোর দিতে হবে। সামনাসামনি কথা খুব জোরে বা খুব আস্তেও বলবে না। যারা বাড়িতে জেলার উপভাষায় কথা বলো তারা রেডিও টিভি শুনে কলকাতার বাংলা উচ্চারণ রপ্ত করবে। বৃহত্তর সমাজে দেশিয় বা দেহাতি উচ্চারণ চলবে না। কথা বলার সময় কতগুলো আদব-কায়দা পালন করতে হবে।

উচ্চারণ : খুব স্পষ্ট উচ্চারণ করতে শেখ। প্রতিটি শব্দের উচ্চারণ সমান জোর দিয়ে উচ্চারণ করবে। কথা বলবে খুব আস্তে বা খুব জোরে নয়। স-শ ও ষ এই তিন স এবং র ও ড় এর মধ্যে উচ্চারণের তারতম্য লক্ষ্য করবে। অনেক Shaw Shaw করে কথা বলে। Shyambazarer Sashibabu শ্যামবাজারের সোসি বাবু নয় শ্যামবাজারের শশীবাবু। বাংলা ভাষার নানা আঞ্চলিক উপভাষা আছে। কিন্তু রেডিও টিভিতে যে ভাষায় বলা হয় সেটাই সঠিক ভাষা। সেই ভাবেই উচ্চারণ করতে শিখতে হবে।

হড়বড় হড়বড় করে কথা বলবে না। একটু আস্তে আস্তে (অর্থাৎ ধীরগতিতে) কথা বলা অভ্যাস করবে। দাঁড়ি, কমা কথা বলার সময়ও মেনে

চলবে। এক নাগাড়ে বেশিক্ষণ না বলে শ্রোতাদেরও কিছু বলতে দেবে। অন্যের কথা শেষ না হলে কথা বলবে না। অপরিচিত লোকদের সঙ্গে গুছিয়ে কথা বলার মধ্যে ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়। ব্যক্তিত্ব নিয়ে আমার আলাদা বই লেখা ইচ্ছা আছে। ব্যক্তিত্ব চরিত্রের একটি দিক। ছেলেমেয়ের আলাপী হতে হবে। ঝটপট অপরিচিত সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে হবে। একটা খাতা করবে যাতে লেখা থাকবে বন্ধুদের নাম ও ঠিকানা। প্রতিবছর ডিসেম্বর মাসে হিসেব করে দেখবে যে বন্ধুর সংখ্যা গত বছরের চেয়ে ৫০ শতাংশ হারে বাড়ছে কি না। অর্থাৎ গতবছর যদি দশজন বন্ধু থাকে তাহলে এবছর সেটা পনের হয়েছে কি না। যদি না হয় তাহলে বুঝবে তোমারই কোথাও ত্রুটি আছে।

পরিশ্রমের কথা বলছিলাম। গরিব ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার সঙ্গে বাড়ির কাজ করতে হয়। আমার ছোটবেলায় বাড়ির অবস্থা ভাল ছিল না। আমাদের চাকর বাকর রাখা তো দূরের কথা, আমাদের ভাই-বোনদের পড়ার খরচই তোলা মুশকিল হয়ে পড়ত। আমি ক্লাস সিক্স থেকে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের পড়াতাম। ঠোঙা তৈরি করে বাজারে বিক্রি করতাম। মুদির দোকানেও কিছুদিন কাজ করি। আমি বাড়ির বাজার হাট করতাম। এখনও করি। আমাদের বাড়িতে টিউবওয়েল ছিল না বলে দূর থেকে বালতি করে জল নিয়ে আসতে হত।

এত কষ্ট করে আমার লাভই হয়েছে। এর ওপর আরও লাভ হয়েছিল আমি স্কাউট আর এনসিসিতে ছিলাম বলে। এই দুটি সংস্থায় থাকলে পরিশ্রম আর স্বাবলম্বনের অভ্যাস হয়।

স্কুলে থাকতে আমি স্কাউট ও এন সি সি দুটোতেই যোগ দিয়েছিলাম। স্কাউট ততখানি সক্রিয় ছিল না। তবে এনসিসি ছিল খুবই সক্রিয়। এন সি সি তে যোগ দিয়ে আমি করপোরাল ব্যাচ পেয়েছিলাম। এন সি সি আমাকে শেখাল কঠিন পরিশ্রম। যখন আমরা প্রতিবছর বার্ষিক শিবির করতে যেতাম তখন প্রতিদিন ভোরে উঠে এক ঘন্টা পিটি করতে হত। এক একদিন ছ সাত মাইল লং মার্চ হত। খুব ভোরে উঠে রাত দশটা পর্যন্ত এক নাগাড়ে আমাদের কাজ করতে হত। শিবিরে আমাদের রোজ জুতো পালিশ করতে হত। সাফাইয়ের কাজ করতে হত। খাওয়ার পর নিজেদের বাসন নিজেদের ধুতে হত। এটাই স্বাবলম্বনের শিক্ষা।

বাড়িতে মেয়েরা খাওয়ার পর পাতের এটো তুলে খাবার প্লেট সিঙ্কে রেখে আসে। অনেক বাড়িতে মেয়েদের খেয়ে নিজেদের বাসন ধুয়ে রাখতে হয়। কিন্তু ছেলেদের এসব শেখানো হয় না। ছেলেমেয়ের মধ্যে কাজের কোন বৈষম্য থাকা উচিত নয়। তাদের সমান ভাবে স্বাবলম্বী হতে হবে। নরেন্দ্রপুরে রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোমের ছাত্রদের দুবেলা খাওয়ার পর নিজেদের থালা ধুয়ে রাখতে হয়। গান্ধীজী স্বাবলম্বনের ওপর এত জোর দিতেন যে গান্ধী আশ্রমে সবাইকে পায়খানা পরিষ্কার করতে হত। গান্ধীজী বলতেন, সবাই কায়িক শ্রম না করার ফলে হুজুর ও মজুর বলে দুটো শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে। হুজুররা কায়িকশ্রম করবেন না। বসে বসে খাবেন। খাটবে মজুররা। এ অবস্থা চলতে দেওয়া যায় না।

আমি একবার বিহারে খাদিগ্রামে গান্ধী আশ্রমে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখলাম, সবাইকে কাজ করতে হচ্ছে। আর কী সহজ সরল জীবন যাত্রা আশ্রমিকদের।

১৯৫৪ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় কল্যাণীতে। আমি স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে যোগ দিয়েছিলাম। স্বেচ্ছাসেবীদের খাওয়া দাওয়া করে প্লেট ধুয়ে জমা দিতে হত। একদিন দেখি খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন খেতে এসেছেন। তিনি কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে ভাত নিলেন। তারপর খাওয়া দাওয়া সেরে প্লেটটি ভাল করে ধুয়ে রেখে গেলেন।

ইংলন্ড আমেরিকায় থাকার সময়ও দেশের অনেক লোকের বাড়ি নেমন্তন্ন হত। ওদেশে ঝি-চাকর পাওয়া যায় না। তাই এক সুন্দর প্রথা চালু আছে। অতিথিরা খাবার পর ডিস ধুয়ে রেখে যাবেন। এতে গৃহকর্তা হাঁ-হাঁ করে ওঠেন না। তিনি এটাকে স্বাভাবিকভাবে নেবেন। অনেক বাড়িতে স্বয়ংক্রিয় ডিশ ধোওয়ার যন্ত্র আছে। তাঁরা বড়জোর বলবেন, ডিসগুলো আপনার মাজার দরকার নেই। বেসিনে রেখে দিয়ে চলে যান।

অনেক ছেলেমেয়ে তাদের ঘর অগোছাল করে রাখে। ইস্কুল থেকে এসে জুতো খুলে ঠিক জায়গায় রাখার তর সয় না। মোজাটা মেঝের এক পাশে গড়াগড়ি যায়। ইস্কুলের পোশাক দলামলা করা পড়ে থাকে। কাল যে ওই পোশাক পরে ইস্কুলে যেতে হবে সে খেয়াল থাকে না।

যেখানে বসে বই পড়া হচ্ছিল বই সেখানেই পড়ে আছে। অথচ তারপর দিন ইস্কুলে যাবার সময় বইটা হয়ত আর খুঁজে পাওয়া গেল না। প্রায়ই

পেন্সিল বক্সটা হারিয়ে যায়। শৃঙ্খলা নিজের জীবনে না থাকলে সে কখনও শৃঙ্খলা অন্যকে শেখাতে পারে না।

আমি দেখেছি অনেক ছেলেমেয়েরই ইস্কুলের বই পড়তে ইচ্ছা করে না। তার চেয়ে খেলাধুলো করতে, টিভি দেখতে ভাল লাগে।

একটা হিসাব নিয়ে দেখা গেছে বাচ্ছা ছেলেমেয়েরাই বেশি টিভি দেখে। টিভি দেখা যে খারাপ তা আমি একদম বলব না। তবে টিভির সব প্রোগ্রাম ছোটদের জন্য নয়। ছোটরা খবর শুনুক। ইন্টারভিউ বা আলোচনা শুনুক। নাকট দেখুক। ডিসকভারি ও ন্যাশনাল জিওগ্রাফির মত চ্যানেল নিশ্চয়ই দেখবে। কিন্তু তা বলে পড়াশোনার বিনিময়ে নয়। ইস্কুলের পড়া আগে। তারপর সময় থাকলে টিভি বা সিনেমা দেখা।

কিন্তু গল্পের বই পড়া বাদ দিলে চলবে না। আজকালকার ছেলেমেয়েরা গল্পের বই পড়ার সময় পায় না। কিন্তু বই না পড়লে বিচারবুদ্ধি গড়ে ওঠে না। ভাষার প্রতি মমত্ব জাগে।

সেজন্যই বলি সময় পেলেই গল্পের বই পড়বে। 'খেলাধুলো পড়াশোনা টিভি দেখা সব বজায় রেখেই সময় বার করে নিতে হবে। পড়াশোনার ব্যাপারে একটা রুটিন করে নিয়ে পড়লে তখন আর সময় পাবার জন্য অত উদ্বিগ্ন হতে হয় না। ❑

শেষ কথা

বড় হতে গেলে পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। প্রকৃতির রাজ্যে যারা পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে তারাই টিকে গেছে। ডাইনোসোর, ম্যামথের প্রাণীর শেষ পর্যন্ত টেকেনি। কিন্তু ইয়োহিপাপস ঘোড়ায় পরিণত হয়েছে। এই প্রাণীটি আগে ছাগলছানার মত ছোট্ট ছিল। তার পায়ে ছিল পাঁচটি করে আঙুল। যখন সে পর্যাপ্ত পরিমাণে দৌড়াদৌড়ি করতে শিখল, তার পা মজবুত হয়ে উঠল। প্রচুর খেতে শুরু করল। তার তখন দাঁত গজাতে শুরু করল। গাধাকে পিটিয়ে রাতারাতি ঘোড়া করা যায় না। কিন্তু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে চেষ্টার দ্বারায় যে কোন প্রাণী উন্নত হতে পারে। যে সব ফল আগে খাওয়া যেত না। উন্নত করার ফলে সে সব ফল এখন খাওয়া যাচ্ছে। যেমন টম্যাটো। তুমি যে যে অঙ্গের যত বেশি ব্যবহার করবে সেই অঙ্গ তত উন্নত হবে। যারা শক্ত কিছু চিবিয়ে খায় তাদের দাঁতও শক্ত হয়। এজন্য সবাইকে শক্ত ছোলাভাজা খেতে বলা হয় দাঁত শক্ত করার জন্য। শিশুদের দাঁত ওঠবার আগে চুষিকাঠি দেওয়া হয় তাঁদের দাঁত শক্ত করার জন্য। শক্ত জিনিস খেতে ইয়াহিপাসের চোয়ালও শক্ত হয়ে উঠেছিল। এক একটি করে আঙুল লোপ পেতে পেতে তার তিনটি মাত্র আঙুল অবশিষ্ট রইল। মাঝের আঙুলটি মোটা হয়ে গেল। এবার হল দুটি আঙুল। পরে সে দুটি আঙুল মিলে পরিণত হল একটি ক্ষুরে।

অনেক আগে হাতির ছিল চারটি দাঁত। কুমির ছিল ত্রিশ হাত করে লম্বা। বাঘের দুটো দাঁত বেরিয়ে থাকত। দাঁতের প্রত্যেকটি ফলা ছ ইঞ্চি করে লম্বা। তার দেহ ভারী ছিল। পরবর্তীকালে বাঘের খাদ্য কমে গেল। তাকে পরিশ্রমী হতে হল। দৌড়তে দৌড়তে তার চর্বি কমে গেল। বড় বড় জন্তু নেই বলে তার বড় দাঁতের দরকার হল না। এখন বাঘের দাঁত আর বেরিয়ে থাকে না। তার দেহের কোথাও আর মেদ নেই।

মানুষও তেমনি। আমাদের বাংলাদেশের মানুষকে পাহাড় বা মরু লোকের মত অত কষ্ট করতে হয় না বলে বাঙালির দেহ দুর্বল। জমিদার ও

বড়লোকে ছেলেমেয়েদের কায়িক শ্রম করতে হয় না বলে তাঁদের দেহ নাদুস-নুদুস। কিন্তু এমন নাড়ুগোপাল মার্কা চেহারা নিয়ে আমরা কী করে আজ দুনিয়ার সঙ্গে শক্তির প্রতিযোগিতায় নামব! শুধু মস্তিষ্ক থাকলেই হবে না। মস্তিষ্ককে বহন করার জন্য শক্ত দেহ দরকার। তাই পরিশ্রম করো। অনেক বাবা-মা তোমাদের আতুপুতু করে রেখে তোমাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে। ভোরবেলা ওঠো, মাঠে গিয়ে ছুটোছুটি করো। হজমশক্তি বাড়াও।

ইস্কুলকে ভাল লাগাতেই হবে। যদি ইস্কুলের পড়াশোনা ভাল না লাগে বাইরের বই পড়। জ্ঞান বাড়াও। যে কাজটা ভাল পারো সেই কাজটাকে আরও উন্নত কর। তারপর মাধ্যমিক পাস করে তোমার যে বিষয় ভাল লাগে সেদিকে যাও। সবাইকে এমএ পাস করতে হবে একথা যারা বলে তারা বাজে কথা বলে। কোন দেশেই বিএ এমএ পাস করে না।

কিন্তু ক্লাস এইটি পর্যন্ত তো সবাইকে পড়তে হবে। কিন্তু যারা লেখাপড়া শিকবে না আবার পরিশ্রমও করবে না তাদের কপালে দুঃখ আছে। আর পরিশ্রম করতে পারলে শরীরটা সুস্থ থাকা চাই। তাছাড়া গায়ে জোর থাকলে মনোবল বাড়ে। দুর্বল বালকের কোনও মনোবল নেই। তারা লোকের দ্বারা সহজে প্রভাবিত হয়। যাদের গায়ে জোর আছে দুর্বলদের তারা দাবিয়ে রাখে।

এছাড়া সুষম খাবারের সঙ্গে দেহের কী রকম সম্পর্ক আছে একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে। অনেক ছেলেমেয়ের চোখ খারাপ। ভাইটামিনের অভাবে অনেক সময় চোখের রোগ হয়। চোখ ভাল না রাখলে অত পড়াশোনা করবে কী ভাবে? চোখ ভাল রাখতে গেলে চোখের যত্ন নিতে হবে। দুবেলা ঠাণ্ডা জলে ঝাপটা দিয়ে চোখ ধুতে হবে। অল্প আলোয় পড়তে নেই আবার খুব উজ্জ্বল আলোও চোখের পক্ষে খারাপ। টিভি খুব কাছ থেকে দেখতে নেই।

খুব বেশি খেলে হাঁসফাস করবে। তাছাড়া যারা বেশি খায় তাদের ওজন বেড়ে যায়। তাদের স্বাভাবিকভাবে হাটাচলা করতে, সিঁড়ি ভাঙতে খুব অসুবিধা হয়। মেদহীন সুস্থ শরীর আদর্শ স্বাস্থ্যের পরিচায়ক। গান্ধীজীর চেহারা দেখেছ। রোগা অথচ ঋজু চেহারা। কোথাও মেদ নেই। গান্ধীজী এই সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন বলেই অত পরিশ্রম করতে পারতেন। এজন্য গান্ধীজীর খাওয়া দাওয়ার ওপর খুব বিধিনিষেধ ছিল। তিনি নিরামিষ খেতেন। ছাগলের দুধ খেতেন। তিনি যেখানে যেতেন সঙ্গে একটি ছাগল

যেত।

তবে গান্ধীজীর মত অমন অদ্ভুত খাদ্যাভ্যাস করা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা যখন তখন যা তা না খেয়ে সুষম খাদ্য খেয়ে আর ব্যায়াম ও খেলাধুলো করে শরীরটাকে তৈরি রাখতে পারি। সাঁতার কাটা, বল খেলা, ছুটোছুটি খেলা, দৌড়োন এসব রোজই দরকার। ছোটরা পড়ার সময়টুকু বাদে অন্য সময় যত ছুটোছুটি করবে ততই ভাল।

বলতে পারো তুমি বার বার প্রার্থনা করার কথা বল কেন?

বলি, একারণে যে প্রার্থনা করলে মনে জোর আসে। সেই সঙ্গে ভাল কাজ করলেও খুব মনোবল বাড়ে। তুমি যদি ঠিক করে নাও রোজ একটা করে ভাল কাজ করবে দেখবে মনোবল কত চাঙ্গা রয়েছে।

ভাল কাজ বলতে কী বলছ?

এই ধরো একজন অন্ধকে রাস্তা পার করে দিলে। তোমার বাড়ির কাজের মেয়েটিকে লেখাপড়া শেখালে। প্রতিবেশিকে বিপদে সাহায্য করলে। পাশের ফ্ল্যাটের বউদির অসুখ করেছে, তার বাচ্চাটিকে এনে একটু রাখলে। ভাল কাজের কি অন্ত আছে। এমনকি তোমার ঠাকুমা অসুস্থ হয়ে বাতের ব্যথায় কষ্ট পেলে তার পায়ে তেল মালিশ করাটাও ভাল কাজ।

যে ভাল কাজ করে তাকে লোকে ভালবাসে। সে খুব জনপ্রিয় হয়ে যায়। তখন তার শত্রুরা আর তার কোন ক্ষতি করতে পারে না। কারণ ভাল কাজের একটা শক্তি আছে। সেই শক্তিই মানুষকে বিপদ থেকে রক্ষা করে। একটু বড় হলেই তোমরা কিন্তু সেবামূলক কাজের মধ্যে যোগ দেবে। বয় স্কাউট বা এন সি সি-তে যোগ দেওয়া খুব ভাল। এতে অনেক ভাল কাজ করার সুযোগ পাবে।

প্রতি বছর ছোট ছেলেমেয়েদের রাষ্ট্রপতি সাহসিকতার পুরস্কার দেন। একটি ছোট ছেলে জলে ডোবার হাত থেকে কাউকে উদ্ধার করেছে। দুর্ঘটনা থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে কাউকে। ডাকাত পড়তে দেখে বুদ্ধি করে পুলিশকে খবর দিয়েছে। এ সমস্ত কাজের মধ্যেই খুব সাহসের দরকার হয়। এই সাহস কোথা থেকে পায় মানুষ? যদি মনের মধ্যে ছোটবেলা থেকেই বাসনা থেকে যে মানুষের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ব তাহলে দেখবে মানুষকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসতে আর কোন সঙ্কোচ হচ্ছে না।

চীন দেশে ভারি সুন্দর নিয়ম আছে। প্রতি রবিবার সেখানে ছেলেমেয়েরা বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের চুল কেটে দেয় বিনা পয়সায়। তাদের জুতোয় কালি দিয়ে দেয়। ফুটপাথের ওপর বসে যায় এই সেলুনগুলি।

সমাজের সবাই সুখী না হলে শুধুমাত্র নিজের সমৃদ্ধিতে সুখ নেই। তুমি যদি ভাল ভাল খাও আর পাশের বাড়ির লোক যদি খেতে না পায় তাহলে সে তোমাকে হিংসা করবেই। সমাজে এমন অনেক অভুক্ত লোক মানেই অনেক বঞ্চিত হিংসুক লোক সৃষ্টি করা তাই আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ বেদে বলা হয়েছিল সবাই সুখী হোক সবাই নিরাময় থাকুক।

আমাদের অভিপ্রায় বা চাওয়া সমান হোক আমাদের হৃদয় সমান হোক।

বড় হতে গেলে যেমন জ্ঞানে ও স্বাস্থ্যে বড় হতে হবে তেমনি মনের দিক থেকেও বড় হতে হবে। হৃদয়কে উদার করতে হবে। মনে আছে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কথা? একজন জ্যোতিষী একসময় তাঁকে বলেছিলেন আপনি রাজা হবেন। তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অত পসার হয়নি। তারপর তিনি বিরাট ব্যারিষ্টার হলেন। প্রচুর টাকা রোজগার করতে লাগলেন। সেই জ্যোতিষী এসে হাজির। তিনি গরিব হয়ে গেছেন। মেয়ের বিয়ে দিতে পারছেন না।

দেশবন্ধুর কাছে এসে ব্রাহ্মণ বললেন—আমায় চিনতে পারছেন? আমি আপনাকে বলেছিলাম, আপনি রাজা হবেন। আপনি রাজা হয়েছেন। আজ

আমি আপনার কাছে সাহায্যপ্রার্থী।

সমস্ত খুলে বললেন ব্রাহ্মণ।

দেশবন্ধু বললেন—আপনি আজ সন্ধ্যাবেলা আসতে পারবেন? ওই সময় আমি হাইকোর্ট থেকে ফিরি। সন্ধ্যায় হাইকোর্ট থেকে ফিরে দেশবন্ধু দেখেন ব্রাহ্মণ এসেছেন। তিনি পকেট থেকে ৪০ হাজার টাকার তোড়া বার করে ব্রাহ্মণের হাতে দিয়ে বললেন—আপনাকে সামান্য কিছু দিলাম। আমার আজকের রোজগার।

এখন বুঝতে পারছ শুধু লেখাপড়া শিখলে বা টাকা রোজগার করলেই বড় হওয়া যায় না। বড় হতে গেলে উদার ও খোলা মনের অধিকারী হতে হয়।❑

পরিশিষ্ট

সারাজীবন ধরে যেসব কথা মনে রাখতে হবে।

বদ অভ্যাস

বদ অভ্যাস প্রথমে মাঝে মাঝে আসে। তারপর কিছুদিনের জন্য বাড়িতে অতিথি হয়। তারপর বাড়ির মালিক হয়ে বসে। তাই বদ অভ্যাস সম্পর্কে সাবধান।

ভয় পেও না

যা সত্য ও ন্যায্য বলে মনে করবে তা করতে ভয় পেও না—ভয়কে যদি ভয় না পাও তাহলে দেখবে যে কোন কঠিন কাজ অনায়াসে করতে পারছ।

কথা নয়, কাজ করে দেখাও

মুখে গরিবের জন্য দরদ অনেকেই দেখাতে পারে। মুখে বড় বড় কথা বলার চেয়ে সামান্য ভাল কাজ করার অনেক দাম।

সাফল্য মানে ঝুঁকি

সাফল্যের জন্য কেউ গ্যারান্টি দিতে পারে না। কিন্তু ঝুঁকি নিয়ে না ঝাঁপিয়ে পড়লে সাফল্য আসে না।

সব সময়ই সঠিক সময়

যদি মনে করো এটা ঠিক কাজ, তাহলে তা যে কোন সময়, যে কোন বয়সেই তা আরম্ভ করতে পারো।

পার্থিব জিনিস বড় জিনিস নয়

কোন পার্থিব জিনিস ধরো জামা-কাপড়, টিভি রেডিও আরও কত কী— এর জন্য লোভ করো না। এগুলো পেলে তো ভাল, না পেলেও কিছু যায় আসে না। কিন্তু যার জন্য সত্যি আকাঙ্ক্ষা করতে পারো তাহলে সুনাম। সহজে তা পাওয়া যায় না। পেলেও তা একটু অসতর্ক হলে হারিয়ে যেতে পারে। টাকা-পয়সা একবার গেলে আবার আসে। কিন্তু সুনাম একবার চলে গেলে আর আসে না।

অজ্ঞতা লুকিও না

যা জানো না, অকটটে বলো 'জানি না'। অজ্ঞতা যত লুকোতে যাবে তত তা বেড়ে যাবে। যত প্রকাশ করবে তত তা কমে আসবে।

নিন্দাকে ভয় পেও না

নিন্দা শুনলে মন খারাপ করো না। যদি নিন্দা না শুনতে চাও তাহলে চুপচাপ বসে থাকো। কোন কাজ কোর না। কিছু বোল না। কিছু শুনো না।

গায়ের জোর ফলিও না

গায়ের জোর বাড়াও। কিন্তু আক্রমণের জন্য নয় প্রতিরক্ষার জন্য। হিংসা সব সময় দুর্বলের অস্ত্র।

দুনিয়া বদলাতে চাও?

যদি দুনিয়াকে বদলাতে চাও তাহলে তোমাকে দিয়ে শুরু করো।

আমরা যেমন

আমরা কেমন? যেমন আমাদের ভাবনা-চিন্তা তেমন। চোর সব সময় অপরকে চোর ভাবে। সাধু সবাইকে সাধু ভাবে।

স্বপ্ন ও বাস্তব

স্বপ্ন দেখার জন্য ঘুমতে পারো। কিন্তু সেই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে হলে জাগতে হবে।

জীবন নামক ব্যাঙ্ক

তোমার জীবন ব্যাঙ্কের মত। কিছু নিতে গেলে আগে থেকে কিছু জমা রাখতে হয়। যা জমা রেখেছ তা থেকে বেশি নিতে পারো না।

বড় শিক্ষক

সবচেয়ে বড় শিক্ষক কে? দুঃসময় ও প্রতিকূলতা। বিপদে না পড়লে মানুষ বিপদ থেকে উদ্ধারের পথ খুঁজে পায় না।

সৌজন্য

প্রত্যেক কথার আগে প্লিজ আর শেষে থ্যাঙ্কু বলতে কোন খরচ নেই। কিন্তু এই দুটি কথার লাখ টাকা দাম।

জ্ঞানের শেষ নেই

যত আমরা জানব ততই বুঝব আমরা কিছুই এতদিন শিখিনি।

ভুল এক মূল্যবান অভিজ্ঞতা

যে ভুল করেছে বার বার তাকে বোকা মনে কোর না। মুক্ত মনের অধিকারী হও। কোন লোক বা বিষয় সম্পর্কে বদ্ধমূল ধারণা করে রেখ না। একটি পাত্র আগে থেকে ভর্তি থাকলে তাকে আর ব্যবহার করা যায় না। সেজন্য দরকার খালি পাত্র। তেমনি ভাল কাজের জন্য চাই মুক্ত মন।

যেমন ভাবনা তেমনি মানুষ

যে মানুষ চিন্তা করে সে তেমন হয়। মানুষ তাই তার চিন্তা-ভাবনার ফসল। তুমি যদি নিজেকে অপদার্থ ভাবো, ভাবতে ভাবতে তুমি সত্যিই অপদার্থ হয়ে যাবে। যদি ভাবো একজন কাজের লোক। তুমি কাজের লোকে পরিণত হবে।

আমি পারব না

একমাত্র বোকারাই বলে আমি পারব না। বিজ্ঞ লোকেরা বলে আমি পারব।

তৃতীয় বিকল্প

সব সময় তিনটি বিকল্প সামনে রাখবে। প্রথমটি হয়তো কোনদিনই পাবে না। দ্বিতীয়টি আসতে হয়তো খুব দেরি হবে। তৃতীয় বিকল্পটি থাকবে হাতের কাছেই। তাই সেটাই গ্রহণ করবে।

অন্যায় স্বীকার করো

যখনই কোন অন্যায় করবে অকপটে স্বীকার করবে। অন্যায় স্বীকার না করলে অন্যায় করার অপরাধ আরও বেড়ে যায়।

যে নৈরাশ্যবাদী

অন্ধকারের মধ্যেও আশাবাদীরা আলো দেখতে পায়। আর নৈরাশ্যবাদীরা আলো থাকলেও সেই আলো নিবিয়ে দেখতে চায় অন্ধকার কেমন। আশাবাদী হও। নৈরাশ্য শুধু তোমাকে কোনদিন আলো দেখতে দেবেনা।

চাইতে হবে

যদি কিছু পেতে চাও চাইতে হবে। যদি কিছু দেখতে চাও তাহলে তার জন্য খুঁজতে হবে। অন্ধ দরজা যদি খুলতে চাও তাহলে দরজায় করাঘাত করতে হবে।

উৎসুক হও

সব সময় জানার জন্য ঔৎসুক্য রাখতে হবে। জ্ঞান আপনা আপনি কারও কাছে যায় না। যে তাকে চায় তার কাছেই যায়।

কল্পনা ও বাস্তব

কল্পনা করো তোমার জীবনে একটা অলৌকিক কিছু ঘটবে। জীবন একদম বদলে যাবে। কিন্তু তার জন্য চুপ করে বসে অপেক্ষা না করে এখন যে অবস্থায় আছ সেই অবস্থাতেই কাজ করে যাও।

যদি সফল না হও

যদি প্রথম চেষ্টায় সফল না হও তাহলে ভেঙে পোড় না। একমাত্র অসাধারণ প্রতিভাধররা ছাড়া প্রথম চেষ্টায় কম লোকই সফল হয়।

বন্ধু আর বই

বন্ধু আর বই খুব ভাল করে পছন্দ করতে হয়। আলাপ রাখবে অনেকের সঙ্গে। বেস্ট ফ্রেন্ড করবে তাকে যার মধ্যে অনেক গুণ আছে। যে তোমাকে খারাপ পথে নিয়ে যাবেনা।

কে তোমার বন্ধু হবার উপযুক্ত নয়

যে তোমায় খারাপ অভ্যাস শেখাবে, পড়াশোনার কথার বলবে না শুধু আড্ডা দিয়ে তোমার সময় নষ্ট করবে, তোমায় নেশা করতে শেখাবে সে তোমার বন্ধু হলে তুমি আর বড় হতে পারবে না। অধিকাংশ ছেলেমেয়ের লেখাপড়া হয় না তাদের কাজের বন্ধুদের দোষে।

শক্ত সমস্যা

সমস্যা মাত্রই শক্ত। তাই কোন সমস্যাই শক্ত নয়। সহজ হলে সেটা আর সমস্যা হত না। প্রত্যেকটি সমস্যারই সমাধান আছে। তোমার কাছে চাবির গোছা রয়েছে। অনেকগুলো চাবি লাগল না বলে ভেঙে পোড় না। হয়তো শেষ চাবিটাই ওই তালার চাবি। আর চাবি দিয়ে না খুললে শেষ পর্যন্ত তালা ভেঙে ঘরে ঢোকাই যায়।

দায়িত্ব হাসিমুখে নাও

দায়িত্ব দুভাবে নেওয়া যায়, হাসিমুখে না হয় ব্যাজার মুখে। হাসিমুখে দায়িত্ব নিলে দায়িত্বটা হালকা লাগে। গজ গজ করতে করতে করলে সেটা আরও ভার বলে মনে হয়।

সম্মান

সম্মান জোর করে আদায় করা যায় না। লোকে স্বেচ্ছায় দান করে। আর দান করে যোগ্যপাত্রকেই। তুমি যদি নিঃস্বার্থভাবে কাজ করো, স্বার্থপর না হও, ব্যবহার ভাল করো লোকে তোমায় স্বেচ্ছায় সম্মান করবে।

সুযোগ

সুযোগ অনেক সময় আসে ছদ্মবেশে। কঠিন কাজের মধ্য দিয়ে। তাই যে কাজ কঠিন বলে মনে হচ্ছে এটাই হয়তো তোমার ভবিষ্যৎ উন্নতির একটা বড় সুযোগ।

কৃতজ্ঞতা

পৃথিবীতে সবচেয়ে খারাপ লোক হল যে অকৃতজ্ঞ। যে উপকারীর উপকার মনে রাখে না। কৃতজ্ঞতা সমস্ত গুণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণ। বড় মাপের মানুষ সে যে উপকারীর কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকে এবং সেটি অকপটে স্বীকার করে।

সহযোগিতা

সহযোগিতা হল দেওয়া এবং নেওয়া। তোমায় কেউ সাহায্য করলে তাকেও তুমি সাহায্য দেবে। একেই বলে সহযোগিতা। যে তোমাকে কিছু উপহার দেবে তাকেও বিনিময়ে উপহার দেবে। তোমায় যদি কেউ খাওয়ায় তাকেও খাওয়াবে। না দিয়ে শুধু নিলে হয় শোষণ।

দয়া কাকে বলবে?

শত্রুর প্রতি দয়া দেখাতে পারাটাই সত্যিকারের দয়া। শত্রুকে হাতে পেয়েও ক্ষমা করার নাম মহত্ত্ব। মহতের কখনও ক্ষতি হয় না।

শোনা ও বলা

বুদ্ধিমান শুনবে বেশি, বলবে কম। যেখানে দরকার নেই সেখানে কথা বলতে যাবে না। যেখানে দরকার, বাধা পেলেও নিজের মত ব্যক্ত করবে।

ধৈর্য হারাবে না

কোন বড় কিছু একদিনে লাভ করা যায় না। ধৈর্য ধরো। ধীরে চলো। রাস্তা দিয়ে যত জোরেই গাড়ি চালাও দেখবে তোমার আগে অনেক গাড়ি যাচ্ছে। কিন্তু ভুললে চলবে না তারা যাত্রা শুরু করেছে তোমার আগে।

নীরবতা

অনেক সময় নীরব থাকাই ভাল। প্রতিবাদ ও হই-হট্টগোল করে অন্যের হই-হট্টগোল থামানো যায় না। একমাত্র নীরবতা দিয়েই গণ্ডগোল থামাতে হয়। বিপদের সময় চুপচাপ থাকাই ভাল। অথবা কেউ তোমার সম্পর্কে খারাপ কিছু বলেছে বলে তোমার কানে এল—তুমি চেপে যাও। চুপ করে থাকো। প্রতিবাদ করে এই ধরনের নোংরামি বন্ধ করা যায় না।

ঈশ্বর ও পরীক্ষা

পরীক্ষায় পাসের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো, কিন্তু নির্ভর করো নিজের প্রস্তুতির ওপর।

অহংকার একটা রাক্ষস

অনেক লোক বড় পদ পেলে অহংকারী হয়ে ওঠে। তখন আর আগের মানুষটাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। অহংকার রাক্ষসের মত তাকে খেয়ে ফেলে। উগরে দেয় তার প্রেতাত্মাকে।

স্রোতের বিরুদ্ধে

স্রোতের সপক্ষে একটা মড়াও ভেসে যেতে পারে কিন্তু স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড় টেনে এগিয়ে যেতে পারে একমাত্র জীবন্ত মানুষই।

বই পড়া

বই পড়লেই জ্ঞান বাড়ে না। বই পড়ার পর মনের মধ্যে যে সব প্রশ্ন জাগে সেই সব প্রশ্নের সমাধান বই এর মধ্যে পেলে তবেই জ্ঞান বাড়ে।

সত্য

সত্যিকথা বলার পর আর সেখানে দাঁড়াবে না। কারণ সত্যবাদীকে সব সময় সত্যকথা বলার শাস্তি পেতে হয়।

কোন কিছু বদলায় না। শুধু আমরা বদলাই।

আসল-নকল

কখনও অন্যকে নকল করবে না, এমনকী মনীষীদেরও নয়। মনীষীদের অনুসরণ করার চেষ্টা করবে। স্বামীজীর সব গুণ নকল করলেও লোকে বলবে নকল স্বামীজী। কিন্তু স্বামীজীকে অনুসরণ করলে লোকে বলবে একজন খাঁটি ভক্ত।

বেশি নম্বর

পরীক্ষায় বেশি নম্বর পায় সেই যার মধ্যে মৌলিকতা আছে। না বুঝে মুখস্থ করা পণ্ডশ্রম।

সৃজনশীলতার অভ্যাস

নিজের মন থেকে কিছু উদ্ভাবন করার ক্ষমতাকে সৃষ্টিশীলতা বলে। সৃষ্টিশীলতা বা সৃজনশীলতা তোমার বন্ধ ঘরের চাবিকাঠি। সৃষ্টিশীল হও। ছবি আঁকো, গল্প কবিতা লেখো, যদি না পারো তাহলে নিজেকেই নিজে তৈরি করো—তুমিই হবে তোমার শ্রেষ্ঠ শিল্পী।

যদি বকুনি খাও

বকুনি খেলে অভিমান কোর না। আকাশে তো কত বিদ্যুৎ চমকায়। কত মেঘ করে। ঝড় বৃষ্টি আসে, আকাশ কিছুই মনে রাখে না। তুমিও বকুনি মনে রেখ না। শুধু মনে রেখো তিরস্কার এক ধরনের পুরস্কার। তিরস্কার মানুষকে জেদী করে। জেদ তাকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

সততা

যদি সৎ থাকো মানসিক শান্তি পাবে। মানসিক শান্তি জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার সৎ মানুষই এই পুরস্কার পায়।

রাগের বশে

খুব রাগ হয়ে গেলে চুপ করে যাবে। মনে মনে এক থেকে দশ গুনবে। তাতেও রাগ না পড়লে ওই জায়গা থেকে চলে যাবে।

পশুপাখি

মানুষকে ভালবাসা মহৎ কাজ। কিন্তু পশুপাখিকে যে ভালবাসে সে আরও মহৎ। পশুপাখি গাছপালাকে যে ভালবাসে বুঝতে হবে তার মন খুব বড়।

একটা গাছ

গাছ কেটো না। গাছ পোঁত। একটা গাছ মানে একটা প্রাণ। অনেকখানি অক্সিজেন আর বেশ কিছু সম্পদ।

মিতব্যয়ী হও

বাজে পয়সা নষ্ট না করে পয়সা জমাতে শেখো। একশ টাকা জমলেই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোল।

নিজের পায়ে দাঁড়াও

সব সময় বাবা মায়ের কাছে টাকা না চেয়ে নিজে সামান্য কিছু টুকটাক রোজগার করতে শেখো। বাচ্চা ভাই বোনদের শনি-রবি করে এক ঘন্টা পড়াও। অথবা পাড়ায় কোন অনুষ্ঠান হলে কিছু একটা বিক্রি করো।

মিশুকে হও

চুপচাপ একা একা থেকো না। ইস্কুলে এবং পাড়ায় সকলের সঙ্গে মেশো। তাই বলে খারাপ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশবে না।

এগিয়ে চল

প্রতিজ্ঞা করো, দেশকে ভালবাসবে। দেশের জন্য কিছু করো। দেশের মানুষ তোমার পড়াশোনার খরচ যোগাচ্ছে তাই লেখাপড়া শিখে দেশের মানুষের জন্য কিছু করবে।

❁ **সমাপ্ত** ❁